# আমার স্বামী ওয়ালী

আন মারি ওয়ালীউল্লাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে আন মারির স্মৃতিকথা এক অসাধারণ রচনা।...আমাদের সাহিত্যের, আমাদের কালের, একজন বড়ো স্রষ্টাকে জানতে আন মারির এই বই সহায়ক হবে, এমনকী, আমি বলব, অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। ওয়ালীউল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে—দুটি উপন্যাস ও একটি ছোটোগল্পের বিষয়ে—নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আন মারি যা বলেছেন, তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আনিসুজ্জামান

আমার স্বামী ওয়ালী আন মারি ওয়ালীউল্লাহ

ISBN 978 984 90193 1 2
9 789849 019312

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা ভাষার অন্যতম প্রধান কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। চাকরির সুবাদে তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ কেটেছে বাংলাদেশের বাইরে, নানা দেশে। বাঙালি পাঠক তাঁর কথাশিল্প সম্পর্কে জানে, উচ্চ ধারণা পোষণ করে। কিন্তু ব্যক্তি ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি। তাঁর স্ত্রী আন মারি ওয়ালীউল্লাহ (বৈবাহিক জীবন ১৯৫৫-১৯৭১) তাঁর সম্পর্কে খুবই অন্তরঙ্গ একটি ছবি এঁকেছেন এ বইয়ে। ওয়ালীউল্লাহর ব্যক্তিজীবন, তাঁর রুচি, পাঠপরিধি, তাঁর চিত্রকর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি তাঁর সংবেদনশীল মন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেয় এই বই। ওয়ালীউল্লাহ বিশ্বের সব সাহিত্যকে মানুষের অভিন্ন উত্তরাধিকার বলে গণ্য করতেন। বইটি পড়তে পড়তে শেষ পর্যন্ত ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে তাঁর নিজের এ কথাই সত্য বলে মনে হবে, 'আমি একজন মুক্ত মানুষ। জগৎ আমাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, পুরো জগৎটিই আমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন মারি ওয়ালীউল্লাহ

জন্ম দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের গ্রেনোবলে। যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট স্কলার আন মারি সে দেশে ইংরেজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে ওয়ালীউল্লাহ সিডনির পিট স্ট্রিটে পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাশে। আন মারিও সেই পিট স্ট্রিটেই পাকিস্তান দূতাবাসের ঠিক উল্টো দিকে ফরাসি দূতাবাসে কাজ করতেন। এক অস্ট্রেলিয়ান স্থপতির দেওয়া বড়দিনের এক পার্টিতে তাঁদের পরিচয় ও প্রণয়। আন মারির বয়স তখন ২৩, ওয়ালীউল্লাহর ৩১। ১৯৫৫ সালে তাঁরা বিয়ে করেন। তাঁদের দুই ছেলেমেয়ে। ১৯৭১ সালে ওয়ালীউল্লাহ ফ্রান্সে মারা যান; আন মারি মারা যান ১৯৯৬ সালে। ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে আন মারির কতটা ভালো বোঝাপড়া ছিল, এ বইয়ে এর প্রমাণ মিলবে। তিনি ওয়ালীউল্লাহর একাধিক বই ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# আমার স্বামী ওয়ালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# আমার স্বামী ওয়ালী

আন মারি ওয়ালীউল্লাহ

অনুবাদ
শিবব্রত বর্মন

প্রথমা প্রকাশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার স্বামী ওয়ালী
গ্রন্থস্বত্ব © ইরাজ ওয়ালীউল্লাহ ও সিমিন ওয়ালীউল্লাহ
প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৪১৯, ডিসেম্বর ২০১২
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : কাইয়ুম চৌধুরী
সহযোগী শিল্পী : অশোক কর্মকার
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা ১০০০

**মূল্য : ১৪০ টাকা**

Amar Swami Wali
by Anne Marie Waliullah
Translated from English by Shibabrata Barman
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 140 only

ISBN 978 984 90193 1 2

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# ভূমিকা

১৯৬৯ সালের শেষভাগে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১) সপরিবারে স্বদেশে বেড়াতে এসেছিলেন। সে-সময়ে তিনি কিছুদিন তাঁর জন্মের শহর চট্টগ্রামে কাটিয়ে গিয়েছিলেন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে। আমি তখন সদ্য যোগ দিয়েছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। আমাদের বিভাগের অধ্যক্ষ সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) ছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সমবয়সী, বন্ধু এবং সাহিত্যসাধনায় সমকালীন। তিনি আমাদের বিভাগের পক্ষ থেকে ওয়ালীউল্লাহকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করার পরিকল্পনা করলেন এবং তা আয়োজনের ভার দিলেন আমাকে। দেওয়ানহাট ব্রিজ থেকে আগ্রাবাদে ঢুকতেই ডানহাতে একটা বাড়ির দোতলায় 'খৈয়াম' নামে একটি রেস্টুরেন্ট ছিল। সেখানেই খাওয়ার ব্যবস্থা করলাম। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সস্ত্রীক এসেছিলেন এবং সম্ভবত তাঁর ভাই সৈয়দ নসরুল্লাহও। আমরা বিভাগের সবাই ছিলাম, দু-একজন হয়তো তার বাইরের। ওয়ালীউল্লাহ এই অভ্যর্থনায় খুব প্রীত হয়েছিলেন। বিশেষ করে—ঘটনাটি এই বইতে বিবৃত হয়েছে—ওয়েটারদের একজন যখন নিম্নকণ্ঠে তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল যে, তিনিই *লালসালু*র লেখক কি না, তখন তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেদিনের পর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সৌভাগ্যক্রমে আন মারি ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গে নতুন করে যোগসূত্র স্থাপিত হয় পরে।

১৯৯৪ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে আমি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে অল্প কিছুদিন ফ্রান্সের রাজধানীতে থাকার সুযোগ পাই। আমাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা ও সভ্যতা ইনস্‌টিটিউটে (INALCO) দুটি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার জাতীয় কেন্দ্রে (CNRS) দুটি এবং সোরবোনে একটি বক্তৃতা দিতে হয়। আন মারি তখন CNRS-এ কাজ করতেন। বাংলাদেশে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে আমার বক্তৃতার পরে এক ফরাসিনি ধীরপদে আমার কাছে এসে নিজের পরিচয় দেন, 'আমি আন মারি ওয়ালীউল্লাহ'। তিনি যখন বললেন আমার বক্তৃতা তাঁর ভালো লেগেছে, তখন আমি সেটা মামুলি সৌজন্য বলে ধরে নিলাম। তারপর তিনি যে-কথাটি বললেন, তাতে আমি চমকিত না হয়ে পারলাম না, 'আমার মনে হয়, ওয়ালীউল্লাহ বেঁচে থাকলে বিষয়টি সম্পর্কে সে এভাবেই কথা বলত।' আমি তাঁকে চট্টগ্রামের নৈশভোজের কথা মনে করিয়ে দিলাম। সে-সন্ধ্যা তাঁর বিলক্ষণ মনে ছিল, কিন্তু আমাকে মনে ছিল না বলে তিনি একটু লজ্জাবোধ করলেন। আমি তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত করলাম যে, তিনি নিজের নাম না বললে আমিও তাঁকে চিনতে পারতাম না। আমাদের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচে গেল। আরেক দিন তিনি আমাকে মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করলেন। তখন তিনি ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে অনেক গল্প করলেন, আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু কথা বললাম, ওয়ালীউল্লাহর একজন ইংরেজি অনুবাদক ওসমান জামাল—যাঁর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল—তিনি যে আমার বন্ধু,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-কথা জানাতেও ভুললাম না। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোবার আগেই আমরা পরস্পরকে আদ্যনাম ধরে সম্বোধন করার অধিকার পেয়ে গেলাম।

সে-সময়ে আন মারি আমাকে বলেছিলেন, তিনি অচিরে ঢাকায় আসবেন। সত্যিই তিনি এলেন ১৯৯৬ সালের মার্চে। তিনি উঠেছিলেন ওয়ালীউল্লাহর মামাতো বোন অধ্যাপক সুলতানা সারওয়াত আরা জামান ও কর্নেল কাজী নূরুজ্জামানের আমিনাবাদ কলোনির বাড়িতে। আমি তাঁকে নিয়ে নিউ মার্কেটে ওয়ালীউল্লাহর প্রকাশক নওরোজ কিতাবিস্তানে গেলাম এবং তাঁর ও আবদুল কাদির খানের মধ্যে দোভাষীর কাজ করলাম। তিনি আমার বিশ্ববিদ্যালয়-আবাসে এলেন। তাঁকে নিয়ে আমার স্ত্রী ও আমি বাইরে খেলাম। ওয়ালীউল্লাহর বইয়ের স্বত্বাধিকার দেখাশোনার বিষয়ে তিনি আমাকে কিছু দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। আমি যখন তাঁকে বললাম যে, নিকটাত্মীয় থাকতে আমাকে এ-ভার দেওয়া ভালো দেখাবে না, তখন তিনি সেকথা মেনে নিলেন। আমরা আরও কিছু সময় একসঙ্গে কাটালাম, কলকাতা থেকে আগের বছরে প্রকাশিত আমার *Identity, Religion and Recent History* বইটি তাঁকে উপহার দিলাম এবং ঢাকায় আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি বিদায় নিলেন।

স্বদেশে ফিরে গিয়ে তাঁর নিজের শহর গ্রেনোব্‌লের ছবি-দেওয়া একটি কার্ড (পিকচার পোস্টকার্ড) পাঠান তিনি আমাকে। তাতে লেখা :

11.4.1996

Dear Anis–

I want to thank you once again for the kind help and



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

support you extended to me all throughout my stay in Dhaka, which was very precious to me. I read your book with great interest as well as "Resist fundamentalism" of the Nirmal [Nirmul] Committee and it gave me a clear picture of the situation. It raises a few questions which, I hope, I will have the opportunity to ask you–According to "Le Monde" of March 29th Bangladesh's crises, seem to come to an end with new elections. Let us hope for the "unforeseen good to happen". With my very best regards,

Yours sincerely
a m. Waliullah

শেষ উদ্‌ধৃতিচিহ্নের মধ্যের কথাগুলো তিনি আমার বই থেকে নিয়েছিলেন। পরে নববর্ষে ম্যুনিখ থেকে কার্ড পাঠালেন আমার স্ত্রী ও আমাকে :

With my best wishes for a
happy new year
Hoping we'll meet again
in Paris
and with my renewed
thanks for all the help
you so kindly gave me
last year–

Anne Marie Waliullah



AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর আরও একটা চিঠি পেয়েছিলাম, সেটা হারিয়ে গেছে। আমার স্বভাবসিদ্ধ আলস্য ঝেড়ে তাঁর সব চিঠিরই উত্তর দিয়েছি। তবে আমাদের আর দেখা হয়নি—না ঢাকায়, না প্যারিসে। একদিন খবর পেয়েছিলাম, তিনি আর নেই।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সম্পর্কে আন মারির স্মৃতিকথা এক অসাধারণ রচনা। এটি তাঁদের ষোলো বছরের দাম্পত্য জীবনের কিংবা আঠারো বছরের পারস্পরিক সান্নিধ্যের ধারাবাহিক বর্ণনা নয়। এটি তাঁর স্বামীর সাহিত্যিক জীবনের রীতিনিষ্ঠ পরিচিতিও নয়। এটি ওয়ালীউল্লাহর এমন এক প্রতিকৃতি যা দাঁড়িয়ে আছে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর ভর করে। এর উপকরণ আন মারির অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ; তাঁকে লেখা ওয়ালীউল্লাহর চিঠিপত্র; আর ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যকর্ম যার কিছু কিছু অনুবাদ আন মারি নিজেই করেছিলেন ফরাসি ভাষায়। আমরা জানতে পারি, বাঙালি মুসলমানের যে-সংস্কৃতির মধ্যে ওয়ালীউল্লাহ মানুষ হয়েছিলেন, তার অনেকখানিই তিনি ধারণ করে রেখেছিলেন নিজের মধ্যে—যেমন, মুরুব্বিদের কদমবুসি করার রীতি কিংবা বিশ্বময় মুসলিম সভ্যতার গুণগ্রাহিতা। দেশের বাইরে এতকাল জীবনযাপন করেও ভেতরের বাঙালি সত্তাকে তিনি লালন করেছিলেন সযত্নে : ঘরে লুঙ্গি পরতেন, আন মারি শাড়ি পরলে খুশি হতেন; হাত দিয়ে দেশি খাবার খেতে যেমন পছন্দ করতেন তেমনি ভালোবাসতেন দেশি খাবার রাঁধতে, আন মারিও ভারতীয় আহার্যরন্ধনে পটুত্ব অর্জন করেছিলেন; খেয়েদেয়ে সুপুরি চিবোতে পছন্দ করতেন ওয়ালীউল্লাহ; মার্গসংগীতের ভক্ত হয়েও ভাটিয়ালি গান শুনতে ভালোবাসতেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি। ওয়ালীউল্লাহর পড়াশোনার ব্যাপকতা ও নান্দনিকতার প্রতি একনিষ্ঠতার চমৎকার পরিচয় আছে এ-বইতে। প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর আশ্চর্যজনক সংবেদনশীলতা ছিল। তিনি শৌখিন চিত্রকর হয়ে উঠেছিলেন, স্বগৃহের আসবাবপত্রের নকশা করেছিলেন নিজেই এবং এ-প্রসঙ্গে দেশীয় রীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন।

এতসবের পরেও আন মারি লক্ষ করেছেন এবং, দেখা যায়, ওয়ালীউল্লাহ নিজেও কবুল করেছিলেন যে, তিনি ছিলেন এক উন্মূল মানুষ। জন্মভূমি থেকে দূরে ছিলেন বলে নয়, প্রকৃতিগতভাবেই তাঁর মধ্যে ছিল অপরের থেকে বিচ্ছিন্নতার এক প্রবণতা। তিনি, জানা যাচ্ছে, দুর্জ্ঞেয়বাদী ছিলেন—এই দুর্জ্ঞেয়বাদের মূল আসলে পাশ্চাত্য জীবনদর্শন থেকে উদ্ভূত। তবে তিনি যে বলেছেন, ওয়ালীউল্লাহ উন্মূল ও নিঃসঙ্গ ছিলেন বটে, কিন্তু নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না, এ-কথা খুবই সত্য। আন মারি তাঁকে মার্ক্সবাদী বলেছেন; মার্ক্সবাদী না হলেও তিনি ছিলেন অনেকখানি বামঘেঁষা। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন তাঁর কাম্য ছিল। এ-কথা তো স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে নানাভাবে তিনি আক্রমণ করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। আন মারিও সেদিকটায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ওয়ালীউল্লাহর পড়াশোনার ও উপভোগের পরিধি ছিল অনেক ব্যাপক—সাহিত্য ও চিত্রকলা, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সংগীত, ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সৃষ্টিশীলতা ও নান্দনিকতার সকল অভিব্যক্তিতেই তাঁর আগ্রহ ছিল। মহাযুদ্ধ ও জাতিগত সংঘাতের নানা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন তিনি। তবু তিনি নৈরাশ্যে নিমজ্জিত হননি। বারবার তিনি বলেছেন, সদাশয়তা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের বড়ো গুণ। ওয়ালীউল্লাহর মানবিকতা ও সদাশয়তার উন্মোচন ঘটেছে আন মারির রচনার পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায়। আমাদের সাহিত্যের, আমাদের কালের, একজন বড়ো স্রষ্টাকে জানতে আন মারির এই বই সহায়ক হবে, এমনকী, আমি বলব, অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। ওয়ালীউল্লাহর প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে—দুটি উপন্যাস ও একটি ছোটোগল্পের বিষয়ে—নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আন মারি যা বলেছেন, তাও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

**আনিসুজ্জামান**
২৫ অক্টোবর ২০১২

AMARBOI.COM



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# আমাদের সাক্ষাৎ

তার কথা যখন ভাবি, মনের মধ্যে কী ছবি ভেসে ওঠে?

মনে পড়ে তাকে প্রথম দেখেছিলাম ঘরের সবচেয়ে দূরবর্তী একটি কোণে ডিভানে বসে থাকতে, দেখে মনে হয়, কোথায় যেন হারিয়ে গেছে, চারদিকে মানুষজন চোখে পড়ছে না তার। নিজেকে দূরে রাখার এই স্বভাবের কারণেই কি ঘরের ওপাশে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে আমার মন টেনেছিল? সত্যি কথা বলতে, ওখানে আমিও কাউকে চিনতাম না। তা ছাড়া ওর মধ্যে আমি এক পরদেশি আবহ পেলাম, কাজেই আমার সঙ্গী মনে হলো তাকে। তার কোন জিনিসটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল? 'এখানে কেন এসেছি'-মার্কা একটি ভঙ্গিমা, যেমনটা আমি নিজেও অনুভব করছিলাম? ওর চোখের কোমলতা, ওর হাসি? ওর অপূর্ব হাতে ধরে রাখা ৫০টি সিগারেটের গোলাকার টিন, যা সে কখনোই হাতছাড়া করেনি! ওর মার্জিত ভঙ্গিমা? ওর চৌকস ভাব? নম্রতা? জানি না। হয়তো এর সবই। আমি ফরাসি, এ কথা জানার পর সে ফরাসি লেখকদের ব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল। সেটা ছিল এক অস্ট্রেলিয়ান স্থপতির দেওয়া



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়দিনের পার্টি। অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে সে সময় কর্মরত তার বন্ধু হাশেম তাকে এ পার্টিতে নিয়ে এসেছিল।

মনে পড়ে, তাকে আরেকবার দেখেছিলাম পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে। সেই বিচ্ছিন্নতার ভাব, ও যেন ওখানে নেই, সহকর্মীদের থেকে যেন কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। রাষ্ট্রদূত হারুনের নির্দেশ অনুযায়ী সবাই খুব চৌকস পোশাক-আশাক পরেছে, বোতামের ফুটোয় গোলাপি ফুল গোঁজা।

আমরা দুজনই ১৯৫২ সালের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় হাজির হয়েছিলাম। সে ছিল সিডনির পিট স্ট্রিটে নতুন খোলা পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস অ্যাটাশে। আমিও সেই পিট স্ট্রিটেই পাকিস্তান দূতাবাসের ঠিক উল্টোদিকে ফরাসি দূতাবাসে কাজ করি।

আমার বয়স তখন ২৩। ওর ৩১। দিল্লির পর এটি ওর দ্বিতীয় কর্মস্থল। আমি ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে ফুলব্রাইট স্কলার। সেখানে ইংরেজিতে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়েছি। দেশের বাইরে এটিই ছিল আমার প্রথম চাকরি। অস্ট্রেলিয়া দেশটাকে আমাদের দুজনেরই ভালো লেগে গিয়েছিল। ভালো লেগে গিয়েছিল এর মানুষজন। ওরা খুব মুক্তমনা। নিজেদের খুব বিচ্ছিন্ন আর দূরবর্তী মনে করত বলেই অন্য দেশের প্রতি তাদের ভীষণ কৌতূহল।

মাস খানেক পরে সে আমাকে ওর বাসায় নিমন্ত্রণ জানাল। সেবারকার সমাগমের ভেতর আমি খুব লজ্জা বোধ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিলাম। সেটা কি ওর চোখে পড়েছিল? আমাকে ও বলল, আমি যেন নিচে বিয়ারের বোতল খোলার কাজে তাকে সঙ্গ দিই। আর তৎক্ষণাৎ ও আমার হাত ধরে নিয়ে চলল।

মনে পড়ে, পোতাশ্রয় বরাবর আমরা দীর্ঘ ভ্রমণে বেরোতাম। অজস্র অপূর্ব শ্বেতশুভ্র বালুকাময় সৈকতে হাঁটতাম আমরা। কিংবা জঙ্গলে যেতাম; হাতির মতো বিশাল, শক্ত, ধূসর পাথরে বসে থাকতাম; চারদিকে বুনো পরিবেশ, অস্ট্রেলিয়ার বিচিত্র নিসর্গ। কোথাও লালচে মাটি, কোথাও ধূসর কাঁটাময় ঝোপঝাড়, নয়নাভিরাম রুপালি গাঁদ গাছের মসৃণ কাণ্ড আর শাখা-প্রশাখা, বাতাসে থরথর করে কাঁপছে চিকন পাতা। এসব জায়গায় আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, জীবনের অর্থ কিংবা কোরিয়ার যুদ্ধের মতো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনায় ডুবে যেতাম। যেকোনো বিষয়ে তার জ্ঞানের বিস্তার দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম।

শুধু যে তার নিজের দেশ, তার ধর্ম, উপমহাদেশের ইতিহাস বিষয়েই জানাশোনা ছিল, তা-ই নয়, ইউরোপের ইতিহাস এবং পশ্চিমা, বিশেষত ফরাসি সাহিত্যেও ছিল তার অগাধ দখল। তার মতো এত বিদ্বান লোক আমি খুব কমই দেখেছি। এক হিসেবে সে ছিল আমার গুরু, যদিও তার সব ভাবনা আমি বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিতাম না এবং কখনো কখনো মাসের পর মাস তর্ক করতাম। তবে সে ছিল তর্কে অক্লান্ত। কাজেই আমি ঔপনিবেশিক শক্তি বা ক্রুসেডারদের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে, বলতে গেলে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপনিবেশিতদের বা মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সবকিছু দেখতে শুরু করলাম।

মনে পড়ে, রানি এলিজাবেথ যখন সিডনিতে এলেন, সবাই তাঁকে দেখার জন্য কেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েছিল। তাঁর যাওয়ার দু দিন আগে থেকে পথের দু ধারে আস্তানা গাড়তে শুরু করেছিল মানুষজন। আস্তানা গাড়ার চিন্তা আমাদের মাথায়ও এল। আমরা ঠিক করলাম, ভিড়ভাট্টা এড়াতে আমরা শহরের বাইরে চলে যাব। ওর ছোটখাটো হিলম্যানটাতে চড়ে আমরা জঙ্গলে চলে গেলাম। কোনো অজ্ঞাত কারণে ওই গাড়িটার নামও সে রেখেছিল সুজি।

মনে পড়ে, ক্যানবেরার কাছে শ্বেতশুভ্র বালুকাময় অপূর্ব সৈকত জার্ভিস বে-তে আমাদের তিন দিন কাটানোর কথা। সেখানে কুয়াশাচ্ছন্ন দিনে আমরা দুজন নিঃসঙ্গ হেঁটে বেড়িয়েছি। ওর পরনে ছিল সাধারণ রঙের একটি পশমি জ্যাকেট, আমি বিনাকের খোলস দিয়ে তার পকেট ভরে দিচ্ছিলাম।

সিডনির শহরতলি ভাউক্লুসে সে যে বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিল, সেটির কথা মনে পড়ে। পাহাড়ের ওপর তৈরি বাড়ি। সামনেই বন্দর। বিস্তীর্ণ সমুদ্রের পুরোটাই দেখা যায়। সেখানে বসে ও শোনে ওর প্রিয় শুবার্টের অসমাপ্ত সিম্ফনি নয়তো এর প্রিয় চাইকভস্কির 'প্যাথেটিক' সিম্ফনি। এই বাসায় দমকা বাতাসে দরজা-জানালার আর্তনাদ আর কম্পনের শব্দ হয়তো ওকে তার নিজ দেশের কথা মনে করিয়ে দিত।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে, ওর কয়েকজন খাঁটি অস্ট্রেলীয় বন্ধুর সঙ্গে সে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। ওরা সবাই তাকে ভালোবাসত এবং খোঁচাত। বস্তুত, তাদের সবার সঙ্গেই আমরা যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছিলাম। ইউরোপে বেড়াতে এলে ওরা প্যারিসে আমাদের এখানে এসে উঠত। সাংবাদিক মহলে ও খুবই জনপ্রিয় ছিল। ওরা ঠাট্টাচ্ছলে ওকে 'উলুমুলু' বলে ডাকত। সিডনির একটি জায়গার নাম 'উলুমুলু'।

মনে পড়ে, ও যখন আমাকে ক্রিকেট খেলার নিয়মকানুন শেখানোর চেষ্টা করছিল, আমি তা নিয়ে খুব মশকরা করেছিলাম। ক্রিকেটের নিয়মকানুন আমার কাছে খুবই জটিল মনে হয়েছিল (ফ্রান্সে তখন ক্রিকেট খেলার প্রচলন হয়নি, এখনো খেলা হয় খুব ক্ষুদ্র পরিসরে)। সে পাকিস্তানি কর্মকর্তা ও অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ক্রিকেট খেলত।

মনে পড়ে, আমরা দুজনই দার্শনিক আলোচনা পছন্দ করতাম। যারা এ-জাতীয় আলোচনা করতে পারত, তেমন বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগত আমাদের। আমরা দুজনই মনে করতাম, মানুষের ভেতর স্বভাবসুলভ মঙ্গলচিন্তা কাজ করে। নৃতত্ত্ব বিষয়ে নতুন নতুন বই পড়তাম আমরা। পড়ার পর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম। মোট কথা, আমি তার গুণমুগ্ধ ছিলাম। একটা কোনো বই, বা আমরা দুজনে দেখেছি এমন কোনো চলচ্চিত্র, কিংবা যাদের সঙ্গে আমরা মেলামেশা করছি, কিংবা কোনো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, অথবা কোনো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ে তার মতামত জানার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম।

মনে পড়ে, আমাকে ও দেশভাগ এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিল, জানিয়েছিল কলকাতার সেন্ট পল কলেজে তার ছাত্রজীবনের কথা। ও বর্ণনা করেছিল, একবার পিকনিকে গিয়ে দুজন মুসলমান ছাত্রকে আলাদা খেতে হয়েছিল। ও বলেছিল, রেলস্টেশনে পানির কল থাকত দুটি। একটা হিন্দুদের জন্য, একটা মুসলমানদের। একটি ঘটনার বিবরণ শুনে খুব আমোদ পেয়েছিলাম। নয়াদিল্লিতে প্রেস অ্যাটাশের দায়িত্ব পালনকালে সে একবার ট্রেনে ভ্রমণ করছিল। ট্রেনের কামরায় দুজন চমৎকার নারীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। একজন মা, অন্যজন মেয়ে। তারা খুব শিগগিরই আপনজনের মতো গল্পগুজব জমিয়ে বসে।

একসময় ট্রেনটি এই দুই মহিলার গন্তব্যে এসে পৌঁছায়। এখানে ওয়ালীকে তার ট্রেন পাল্টাতে হবে। তখন প্রায় মধ্যদুপুর। ওয়ালীর ট্রেন আসার আরো দু ঘণ্টা দেরি। কাজেই দুই মহিলা তাকে তাদের বাড়িতে গিয়ে অন্নগ্রহণের নিমন্ত্রণ জানাল। ওয়ালী রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। দুপুরের খানা যখন প্রস্তুত, দুই মহিলা তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জানাল, ওরা তার বর্ণ জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছে। ওয়ালীর গায়ে ইউরোপীয় সাহেবি পোশাক। দেখে তার জাতপাত বোঝার উপায় নেই। ওয়ালী খুবই দোটানায় পড়ে গিয়ে ভাবল, যদি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে বলে ফেলে সে মুসলমান, এরা খুবই আহত হবে। নির্ঘাৎ এদের আবার ঘরদোর পবিত্র করার কাজে নেমে পড়তে হবে। কাজেই তাদের বিব্রত হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে সে বলল যে, সে ব্রাহ্মণ। মহিলা দুজন ক্ষত্রিয়। বামুনের সঙ্গে একাসনে বসে খাওয়া তাদের চলে না। কাজেই তারা পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওয়ালীর পাতে ভাত বেড়ে দিল। ওয়ালীকে একাই খেতে হলো।

১৯৫৪ সালের আগস্টে ওয়ালী ঢাকায় বদলি হয়ে এল তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে। ১৯৫৫ সালের মার্চে আবার বদলি হয়ে করাচি। সে জেনেভায় বদলির আশা করছিল। কেননা, এখানে এলে ওকে আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারব। সেটা যেহেতু হলো না, ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমি নিজেই করাচি গিয়ে তার সঙ্গে যোগ দিলাম। সেখানেই আমরা বিয়ে করি। সে সময় করাচির মানুষজন খুব আশাবাদী ছিল। নতুন দেশটির কাছে তাদের ছিল বিপুল প্রত্যাশা। ওয়ালীরও আশাবাদ ছিল। খুবই মজার সময় ছিল সেটা। করাচি তখন ছিল খুবই বন্ধুবৎসল শহর। পূর্ব পাকিস্তানের প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছিল আমাদের।

তারপর ১৯৫৫-এর ডিসেম্বরে একদিন হঠাৎ করে তাকে ব্যাংককের সিয়াটো বৈঠকে পাঠানো হলো এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-বিষয়ক তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে তাকে ইন্দোনেশিয়ায় বদলি করে দেওয়া হলো। তাদের প্রধান কার্যালয় জাকার্তায়। ওয়ালীর পদ হলো সেকেন্ড সেক্রেটারি। তার কর্মপরিধি হলো



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, বার্মা ও ফিলিপাইন। জার্কাতায় আড়াই বছর অবস্থানকালে সে এই সবগুলো দেশ ঘুরেছে। সুমাত্রাতেও গেছে। দুর্ভাগ্যবশত আমি কোনোটাতেই যেতে পারিনি। মনে পড়ে, প্রতিটি দেশে সে ঔপনিবেশিক শক্তির ফেলে যাওয়া পদচিহ্ন দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিল। সে দেখেছে: সায়গনে ফরাসি, ম্যানিলায় হিস্পানি, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ প্রভৃতি শক্তির পদচ্ছাপ।

মনে পড়ে, ইন্দোনেশিয়ায় পা রেখে রিকশাওয়ালাদের জুতো পরতে দেখে, যাত্রীর জন্য অপেক্ষা করার অবসরে সংবাদপত্র পড়তে দেখে, আমাদের গৃহপরিচারিকা মহিলাকে পরিচ্ছন্ন পোশাক এবং খোঁপায় ফুল গুঁজে রাখতে দেখে আর তাদের ছিমছাম সুসজ্জিত বাড়িঘর দেখে আমরা দুজন খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। তার নিজের দেশের দরিদ্র অশিক্ষিত মানুষজনের সঙ্গে এদের তুলনা করে ওয়ালী খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিল।

মনে পড়ে, আমরা দুজন একসঙ্গে জার্কাতা গিয়েছিলাম, জাভায় বোরোবুদুর বৌদ্ধ মন্দির আর বানদুংয়ের কাছে চা-বাগান ঘুরে ওর নিজের দেশের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

মনে পড়ছে, বিদেশি তথ্যকর্তারা আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। সন্ধ্যাবেলা তারা বেড়াতে আসত আর সর্বসাম্প্রতিক খবরাখবর আমাদের জানাত।

মনে পড়ে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত খালিকুজ্জামানের কথা: তাঁর লম্বা অভিজাত দেহকাণ্ড, তাঁর চৌকস লক্ষ্ণৌ-পোশাক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ওয়ালীকে যেভাবে তিনি লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেওয়ার গল্প বলতেন, ওয়ালীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা শুনতাম আমি।

মনে পড়ে, ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি আমার জন্মদিনে ওয়ালী একটা বিরাট পার্টির আয়োজন করেছিল। ওই দিন ছিল ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। ভারতের কূটনীতিক ও অন্যরা ভেবেছিল, কাশ্মীর বিরোধের জের ধরে ভারতীয় দূতাবাসকে কটাক্ষ করার জন্যই সে এ দিনটি বেছে নিয়েছে।

সকালবেলা আমি ফরাসি সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে কাজ করতাম। কূটনীতিক ও বিদেশি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমরা একপ্রকার সাংস্কৃতিক সংঘ তৈরি করেছিলাম। প্রতি মাসে আমাদের মধ্যে কেউ একজন নিজের খুশিমতো কোনো বিষয়ে বক্তৃতা করত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে। ওয়ালী ভারতীয় ধ্রুপদি সংগীত বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিল।

আমরা খুবই সুখী দম্পতির জীবন কাটাচ্ছিলাম।

১৯৫৮ সালের আগস্টে আমরা ছুটি কাটাতে রেঙ্গুন ও কলকাতা হয়ে চট্টগ্রামে যাই। ওয়ালী আমাকে কলকাতা শহর দেখাতে উদ্‌গ্রীব ছিল। কয়েক বছর সে এ শহরে কাটিয়েছে, তা ছাড়া দেশভাগের সময় সে এই শহরেই ছিল। কিন্তু জাকার্তায় ভারতীয় দূতাবাস থেকে ভিসা জোগাড় করা সত্ত্বেও কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের মাটিতে নামতে দিল না। তারা জানাল, ভিসায় সুনির্দিষ্টভাবে কলকাতা শহরের উল্লেখ নেই (ভারতের কোনো শহরের উল্লেখ অবশ্য ছিল



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না)। সে সময় দু দেশের সম্পর্কে খুবই উত্তেজনা যাচ্ছিল। আমরা দুজনই খুব হতাশ আর ক্ষুব্ধ হলাম।

চট্টগ্রামে ওর আত্মীয়স্বজন—ভাই সৈয়দ নাসরুল্লাহ, তার মামা সিরাজুল ইসলাম এবং তার পরিবারের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁরা সবাই আমাকে অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমার সঙ্গে নববধূর মতো আচরণ করা হলো। ওর বড় মামা সিরাজুল ইসলাম ওয়ালীর খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি ওকে লেখালেখিতে উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং আমার ধারণা, কমরেড পাবলিশিং ও কলকাতায় *কনটেমপোরারি* পত্রিকা বের করার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। খুবই মজার মানুষ ছিলেন তিনি। স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে তিনি একটি সাদা ধুতি পরে বাড়ির পাশের একটি ছোট্ট কুঁড়েঘরে সাধুপুরুষের মতো জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে আমরা রাতের বেলা সেই কুঁড়েঘরে যেতাম। তাঁর রসবোধ ছিল প্রখর। তিনি একটি আত্মজীবনী লিখেছিলেন। নাম দিয়েছেন 'এক গর্দভের স্মৃতি'। সকালে নিজের কালো রঙের ছাতাটি নিয়ে স্ত্রীর কবর জিয়ারত না করা পর্যন্ত তিনি কারো সঙ্গে কোনো কথাই বলতেন না। তাই বলে সকালের নাশতার আগে আমার দিকে মধুমেশানো এক গ্লাস দুধ আর একটি গোলাপ ফুল বাড়িয়ে ধরতে তিনি কসুর করেননি। আমাকে ডাকতেন নাজনিন বলে। দুপুরে খাওয়ার সময় আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে নিজ হাতে আমার প্লেটে খাবার তুলে দিতেন।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে, ওয়ালী, তার ভাই আর কয়েকজন মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে নৌকায় করে আমরা কর্ণফুলী নদীতে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। ওয়ালীর ধূমপানের নেশা চাপলেও ভাইদের সামনে সিগারেট ধরাল না। মনে হলো নাসর ভাই ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। ওয়ালীকে ধূমপানের সুযোগ করে দিতে কোনো কথা না বলে তিনি নৌকার সামনে গিয়ে বসে সোজা সামনে তাকিয়ে থাকলেন। চট্টগ্রাম আমার ভালো লেগে গেল। ভালো লাগল এর মনোমুগ্ধকর ঢেউ-খেলানো সবুজ পাহাড়ের সারি। মনে পড়ে, রাঙামাটি গিয়ে আনারসের খেত দেখেছিলাম। এই সুযোগে ওয়ালী ঢাকায় সৈয়দ নুরুদ্দিন, সানাউল হক, নজমুল করিম প্রমুখ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। তারপর আমরা সবাই সানাউল হকের গ্রামের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বেড়াতে গেলাম। ওখানে গিয়ে ও খুব মজা পেয়েছিল।

AMARBOI.COM

## ইউরোপে

বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আমি করাচি থেকে জাহাজে চেপে ইউরোপের উদ্দেশে রওনা দিলাম। মা-বাবা আমাদের জন্য অধীর অপেক্ষা করছিলেন। আমরা লোহিতসাগর, সুয়েজ খাল পেরিয়ে নেপলসে থাকলাম। সেখান থেকে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলাম পম্পেই নগরী দেখতে। সেখান থেকে জেনোয়া পর্যন্ত গেলাম আমরা। জেনোয়ায় বাবা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আল্পস পেরিয়ে আমরা আমার নিজের শহর গ্রেনোবলে পৌঁছলাম। আমার মা, ভাই, বোন, খালা আর দাদি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরিবারের অন্যদের সঙ্গে দেখা করার জন্য সেখান থেকে আমরা গেলাম প্যারিসে। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন পুরো পরিবার ওর নম্রতা, সহনশীলতা আর সকলের প্রতি টানের কারণে ওকে দ্রুত পছন্দ করে ফেলল। তা ছাড়া আমরা কত সহজে পরস্পরের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পেরেছি, এটা দেখেও তারা আশ্বস্ত হলো। আমার পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যই ইংরেজিতে কথা বলতে পারে। এরপর আমরা একটা সপ্তাহ কাটালাম লন্ডনে। ও বিশেষভাবে লন্ডন সফরের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল। কী করে এমন ক্ষুদ্র একটি দেশ এত বড় একটি সাম্রাজ্য শাসন করতে পারে, এ নিয়ে ওর মধ্যে একটি বিস্ময় ছিল। তারপর আমরা আবার গ্রেনোবলে এলাম।

অক্টোবরের শেষ দিকে মা আর বাবা আমাদের জেনোয়া পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেখান থেকে প্লেনে চেপে করাচি।

ইউরোপে সবার আগে যে জিনিসটি ওর চোখে পড়েছিল, সেটা হলো সভ্যতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। ভারতের মতো বাইরের শক্তির আক্রমণে সেই প্রবাহে ছেদ পড়েনি। বাংলার সাইক্লোনের মতো কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এসে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িঘর আর দালানকোঠা ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি (যে বাড়িতে ওয়ালী জন্মেছিল সেটি বানের তোড়ে ভেসে গেছে)। ইউরোপের শহরগুলোয় অষ্টাদশ বা ষোড়শ শতকের ভবনের পাশে গড়ে উঠেছে আধুনিক ভবন : এমনকি একাদশ, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতকের গির্জা ও মনুমেন্টও শহরের পুরোনো এলাকার অংশ হয়ে টিকে আছে।

আমরা ১৯৫৯ সালের মে মাস করাচিতেই থাকলাম। ও তখন ওএসডি অবস্থায় তথ্য মন্ত্রণালয়ে। সকালে আমি ফরাসি প্রতিষ্ঠান সাইনর‍্যাপ্ট অ্যান্ড ব্রাইসে কাজ করি।

তারপর একটা সাময়িক অ্যাসাইনমেন্টে আমরা ছয় মাসের জন্য লন্ডনে বদলি হয়ে গেলাম। সেখানে আমাদের মেয়ে সিমিনের জন্ম হলো। লন্ডনে ওয়ালীর সঙ্গে দেখা হলো সফিউদ্দীন আহমদ ও আরো কয়েকজন তরুণ চিত্রশিল্পীর সঙ্গে। তাকে আয়ারল্যান্ডে যেতে হলো। সেই সূত্রে সে ডাবলিন আর কর্কে গিয়েছিল। মনে পড়ে ও আমাকে বলেছিল, এক রোববার ডাবলিনের এক নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় ও অবাক হয়ে দেখল, এক আইরিশ ভদ্রলোক তাকে ডাকছে। লোকটি তাকে পেছনের রাস্তা দিয়ে সরগরম এক শুঁড়িখানায় নিয়ে গিয়েছিল (রোববার সব শুঁড়িখানা বন্ধ থাকার কথা)।

১৯৫৯ সালের অক্টোবরে ফার্স্ট সেক্রেটারি মর্যাদায় প্রেস ও কালচারাল অ্যাটাশে হিসেবে ওকে বনে (ব্যাড গোডেসবার্গ) বদলি করা হলো। জার্মানিতে গিয়ে ও অবাক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দেখল, সেখানে এমন কিছু জার্মান আছে, যারা এখনো নাৎসি এবং বিষয়টা তারা ইউরোপীয়দের কাছে লুকালেও এশীয়দের কাছে লুকায় না। পাকিস্তান-জার্মান সমিতির প্রেসিডেন্ট এককালে নাৎসি ছিলেন। একবার এগিয়ে দেওয়ার জন্য পথচারী এক ছাত্রকে গাড়িতে তুলেছিল ওয়ালী। কথা প্রসঙ্গে ছেলেটি এমন ভান করল, যেন গ্যাসচেম্বার বলে কিছুর অস্তিত্বই ছিল না।

বনে জেনারেল রাজার অধীনে কাজ করেছিল ওয়ালী। তিনি নিজে রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্যারিসে বদলি হয়ে গিয়ে ওয়ালীকেও সেখানে বদলি করে নিয়ে যেতে চাইলেন। কাজেই, ১৯৬১ সালের এপ্রিলে আমরা প্যারিসে এলাম। আমাকে আমার নিজের দেশে আনতে পেরে ও খুব খুশি হয়েছিল। প্রথমে আমরা ছিলাম কোয়ে ব্লোরিও। সেখানে সিন নদীর ধারে ওয়ালীর পছন্দ করা একটি ফ্ল্যাটে আমরা থাকতাম। পূর্ব বাংলা থেকে আসা অতিথিরা সিন নদীকে বলত 'কালি'। সাংবাদিকদের সঙ্গে আমাদের ভালো সখ্য তৈরি হলো। নানান জায়গায় বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেত সে। একবার এ রকমই এক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনের জন্য সে তার ভাতিজি সেলিনা বাহারকে নিয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তান তখনো নতুন একটি দেশ। মানুষ এ দেশ সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানত না। ওয়ালী সবাইকে দেশটির মানুষজন, ইতিহাস, সংগীত সম্পর্কে অবহিত করত। লুসি ফরের অনুরোধে তাঁর বর্ণবাদবিষয়ক সাময়িকী *লা নেফ*-এ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের বর্ণপ্রথা সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখেছিল ওয়ালী। ওই পত্রিকায় লিওপোল্ড সেদার সেংঘর, ম্যাক্সিন রডিনসন, মোহাম্মদ দিয়াব, অ্যালান পাইরেফাইটের মতো বিখ্যাত সব লেখকের লেখা ছাপা হয়েছে।

মনে পড়ে, আমাদের প্রথম গ্রীষ্মকালে আমরা পেরিগরে একটি দুর্গে এক পক্ষকাল কাটিয়েছিলাম। ফরাসি শিখতে আগ্রহী বিদেশিরা এ দুর্গে আসে। এখানে ফরাসি ভাষা শিক্ষার ক্লাস নেওয়া হয়। পরিবেশিত হয় ফরাসি খাবার। ফরাসি ভাষায় কথা বলা সেখানে সবার জন্যই বাধ্যতামূলক। প্যারিসে ও দু বছর আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। তত দিনে সে ফরাসি ভাষায় কথা বলা শিখে গেছে এবং ফরাসিতে একটি বক্তৃতাও দিয়েছে। তবে আমরা সব সময় ইংরেজিতেই কথা বলতাম। ও ওর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলত, আর ছেলেমেয়েরা জবাব দিত ফরাসি ভাষায়। (আমি যখন ওকে বিয়ে করেছিলাম, তখন আমি আশা করিনি যে চাকরিসূত্রে ও এত দীর্ঘসময় ফ্রান্সে থাকতে পারবে। আদৌ থাকতে পারবে, এ আশাই করিনি। সে কারণে আমি আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফরাসি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ফ্রান্সেই থাকব, এটা আগে জানলে আমি ওদের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলতাম।)

মনে পড়ে, ওর সঙ্গে মার্সেইয়ের লো কর্বুসিয়ের *লা সিতে রাদিয়ঁস* দেখতে গিয়েছিলাম। ফ্রান্সের আরো বহু জায়গায় ঘুরেছি আমরা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পেন ভ্রমণের ব্যাপারে ওর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে, সে যেতে চাইত আন্দালুসিয়ায় এবং একাদশ শতাব্দীতে যেখানে আরব সভ্যতার পত্তন হয়েছিল ও ইবনে সিনার মতো মহান চিন্তাবিদদের পদচারণ ছিল। গ্রানাদার আলহামরা ও করদোবা মসজিদ ঘুরে দেখার সময় ও আমাকে মুসলিম স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝিয়ে দিয়েছিল। আমরা ওয়াশিংটন আরভিংয়ের আলহামরার গল্পগুলো পাঠ করেছি। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম ১৯৬৩ সালের অক্টোবরে। সঙ্গে ছিল আমার চার বছরের মেয়ে আর আমার মা। আমি তখন *লালসালু* অনুবাদ করছি। মা এ কাজে আমাকে সাহায্য করছিল। কাজেই তিনি স্পেনে এসে বলতে লাগলেন, মজিদের সঙ্গে তিনি স্পেন ঘুরে দেখেছেন।

১৯৬৪ সালের আগস্টে আমরা লিসবনের কাছে সাগরের তীরে একটি বাড়ি ভাড়া নিলাম। আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে সৈকতে স্নান করতে যেতাম। ও বাসায় বসে সে সময়টায় সম্ভবত *কাঁদো নদী কাঁদো* উপন্যাসটি লিখত। তাজে নদী অনুসরণ করে আমরা সড়কপথে ঊষর স্পেন ও শ্যামলিম পর্তুগাল পেরিয়ে এসেছিলাম। আরেক গ্রীষ্মে আমরা ডেনমার্কে একটি খামারে অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। আমার বোনও সঙ্গে ছিল। এখানেও আমরা সৈকতে বেড়াতে গেলে সে সারা দিন বসে বসে লিখত। মাঝেমধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে এলাকাটি ঘুরে দেখতে বেরোত। কাজটি তখন সে খুবই উপভোগ করত।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে, দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে আবার হল্যান্ডে বেড়াতে গিয়েছিলাম। (ব্যাড গোডেসবার্গে থাকার সময় আমরা একবার হল্যান্ডে গিয়েছিলাম)। হল্যান্ডের সমতলভূমি ওকে ওর প্রিয় বাংলার কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল।

মনে পড়ে, কোনো অতিথি এলে ও কী রকম অক্লান্তভাবে ভার্সাই বা প্যারিসের দক্ষিণে ফঁতেনব্লো দুর্গ ও প্যারিস ঘুরে দেখাতে নিয়ে যেত।

যা হোক, পাকিস্তানের কথা প্রচারের এ চাকরির প্রতি একধরনের বিরক্তি জন্ম নিতে শুরু করল ওর মধ্যে, বিশেষত যে কথা এখন আর সে বিশ্বাস করে না সেগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারবার বলা, প্রতিবছর ইকবালের বার্ষিকী আয়োজন করা ইত্যাদি ওর ভালো লাগছিল না। পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পর প্রথম কয়েকটি বছর যে বিরাট প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল, ওর মধ্যে যদি সেটা থেকেও থাকত, বহু আগেই সেটা হারিয়ে গেছে।

১৯৬৭ সালে ইউনেসকোর গণমাধ্যম বিভাগে পি-৫ হিসেবে ও নিয়োগ পেল। পাকিস্তানের প্রচারকের কাজ ত্যাগ করে এ সম্মানজনক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে ও খুব খুশি হয়েছিল। গণমাধ্যম ও সহিংসতা বিষয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করতে আফগানিস্তান ও নেপালের ডিজির সঙ্গে যোগ দিয়েছিল সে।

তবে পি-৫-এর মতো উচ্চপদে নিয়োগ দেওয়া সত্ত্বেও তাকে সংশ্লিষ্ট দায়দায়িত্ব না দেওয়ায় এবং গণমাধ্যম



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগের প্রধানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেবল ডিজির ইচ্ছায় নিয়োগ পাওয়ার কারণে ওই বিভাগে নিজেকে ও কেমন একঘরে বোধ করতে লাগল। গণমাধ্যম বিভাগের প্রধানের নিজের প্রার্থী ছিল। বিষয়টি যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন ও ইউনেসকোর বিরুদ্ধে একটি মামলা ঠুকে বসল। এ মামলায় সঙ্গে সঙ্গে জিতে গিয়েছিল ও। এরপর ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে ও ছুটিতে দেশে গেল।

এরপর দ্রুত ঘটে গেল কয়েকটি ঘটনা: প্রথমে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে গেল, এতে ও খুব খুশি হয়েছিল, ইউনেসকো রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করল, শুনানি শুরু হবে জেনেভায়, কয়েক দফা স্থগিত করা হলো সেই শুনানি। ওর ভাবি মারা গেলেন, ও আবার ঢাকা ফিরে গেল, তারপর পূর্ব পাকিস্তানে ঘটল সেই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, আমরা সবাই ভীষণ মর্মাহত। ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে ইউনেসকোর সঙ্গে ওর চাকরির চুক্তি বাতিল করা হলো। কাজেই ১৯৭১-এর শুরুতে ও বেকার হয়ে পড়ল। ১৯৭১-এর শেষ দিকে জেনেভায় হবে তার ইউনেসকোর চাকরির মামলার রায়। কাজেই পাকিস্তান সরকারের চাকরিতে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করল ও।

কিন্তু শিগগিরই আরেক ভয়াবহ ট্র্যাজেডিতে ও মুষড়ে পড়ল—পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দেশকে কীভাবে সাহায্য করবে তা বুঝে উঠতে না পেরে ও ভীষণ হতাশ হয়ে পড়ল। আঁদ্রে মালরো ও কয়েকজন ফরাসি



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংবাদিকের সঙ্গে যোগাযোগ করল ওয়ালী। পাকিস্তানে ফেরার আর প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই আমি সিএনআরএস (ন্যাশনাল সেন্টার ফর সায়েন্টিফিক রিসার্চ)-এ চাকরি নিলাম। ম্যুদঁ থেকে ১৫ মাইল দূরে অফিস। আমি অফিসে যাই, ও বাসায় বসে থাকে। ব্যাপারটা খুবই অবমাননাকর মনে হতে লাগল ওর কাছে। ১৯৭০-এর শেষ দিকে আমরা ম্যুদঁতে একটি বাড়ি কিনেছিলাম। ও পুরো বাড়িটি নিজ হাতে নতুন করে রং করার সিদ্ধান্ত নিল। যা হোক, ও সারা দিন একা বাসায় বসে থাকে, দুশ্চিন্তা করে আর ধোঁয়া ছাড়ে।

এরপর সে লন্ডনে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশকে সাহায্য করার জন্য সংগঠিত হওয়ার পরিকল্পনা করে। সঙ্গে সে ওর ৭ বছর বয়সী মেয়েকে নিয়ে যায় এবং রাজেশ্বরী দত্তের বাসায় ওঠে। তারপর ফিরে আসার কিছুদিনের মধ্যে হার্ট স্ট্রোক করার আধ ঘণ্টার মাথায় তার মৃত্যু হয়। যুদ্ধ নিয়ে তার গভীর উদ্বেগ এবং সেই সঙ্গে তার ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তাই এ অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী। ম্যুদঁতে তাকে সমাহিত করা হয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ও নিঃসন্দেহে সবচেয়ে খুশি হতো। অথচ বাংলাদেশের জন্মের দুই মাস আগে ১৯৭১ সালের ১০ অক্টোবর তার মৃত্যু হয়। দেশটিকে সে বাংলা, পূর্ব বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান নামে ডাকত। আমি পূর্ব পাকিস্তান নামটি এড়ানোর জন্য একে পূর্ব বাংলা হিসেবে উল্লেখ করব।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ করার বিষয়, আমি বাঙালি হিন্দুর বিপরীতে তাকে বাঙালি মুসলমান হিসেবে আখ্যায়িত করছি। কেননা, ধর্মীয়ভাবে না হলেও সাংস্কৃতিকভাবে সে বাঙালি মুসলমানই ছিল। সেভাবেই সে বেড়ে উঠেছে।

দেশকে সে গভীর ভালোবাসত। পূর্ব বাংলার সৌন্দর্য, অজস্র আঁকাবাঁকা নদী, সবুজ খেত, তরুবীথির পেছনে ঢাকা পড়া ছোট ছোট গ্রাম, বাঁশঝাড়, কাঁঠালগাছ, দামাল মেঘ, দমকা বাতাসের সঙ্গে মৌসুমি বৃষ্টিতে বেরিয়ে পড়া শিশু-কিশোরের দল-আমাকে এসব দেখানোর জন্য সে উদ্‌গ্রীব ছিল। আমাকে সে বৃষ্টির দিন নিজ হাতে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়ার গল্প শুনিয়েছিল। আমাকে সে শুনিয়েছে কত্থক নাচ, মোগল রাজদরবার, মোগল সম্রাটদের বানানো অপূর্ব সুন্দর সব প্রাসাদ, তাদের উচ্চমানের সংস্কৃতির কথা এবং একই সঙ্গে তুলনা টেনেছে ইউরোপের সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার। নিজের দেশের দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, দেশটিতে ব্রিটিশ, হিন্দু জমিদার এবং এখন পাকিস্তানিদের শোষণকে ঘৃণা করত সে। সে আমাকে বাংলার লোককাহিনি শোনাত, বাংলার সাহিত্য ও ইতিহাস বর্ণনা করত, সে শোনাত সেই সব মুসলমান তাঁতিদের কথা, যাদের নামে সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়ের নামকরণ হয়েছে; সে বলত মসলিনশিল্প ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য কীভাবে ইংরেজরা তাঁতিদের হাতের আঙুল কেটে দিত, বলত নীল বিদ্রোহের কথা। সে বলত, মুসলমানরা ব্রিটিশদের এত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘৃণা করেছে যে, তারা তাদের সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে লেখাপড়া করতে পাঠায়নি, ব্রিটিশ শাসকদের কোনো রকম সহযোগিতা করেনি, তারা আশ্রয় নিয়েছে ধর্মকর্মের কাছে আর এ কারণে তার মুসলমান-সমাজ পশ্চাৎপদতায় নিমজ্জিত হয়েছে, এদিকে মুসলমানদের সরে দাঁড়ানোর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়। দেশভাগের সময় যখন দাঙ্গা হয়, তখন ও কলকাতায় ছিল। সেখানে ও যে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ দেখেছে, সে গল্প ও আমাকে শুনিয়েছে।

বিদেশে থাকাকালে ওয়ালী তার দেশ, তার ঢাকার বন্ধুদের অভাব খুব বোধ করত। বাংলা বলতে না পারার অভাবও খুব অনুভব করত সে। করাচিতে কর্তব্যপালনের সময় সে একপ্রকার বাঙালিদের সঙ্গেই শুধু মিশত। প্যারিসে ও প্রখ্যাত কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের স্ত্রী রাজেশ্বরী দত্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে। রাজেশ্বরী নিজে শান্তিনিকেতনের ছাত্রী এবং বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী। ওয়ালী ওর বাঙালি বন্ধু সানাউল হক, নজমুল করিম, শওকত ওসমান, সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, মতিন, ওর জ্ঞাতিভাই জহুর হোসেন এবং অন্যদের দাওয়াত দিতে পছন্দ করত। তাদের সঙ্গে ও বাংলার ভবিষ্যৎ, বেতনসাম্য, পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ইত্যাদি নিয়ে রাত জেগে বাংলায় আলাপ-আলোচনা করত। আমার মনে হয়, মাঝেমধ্যে ওরা এমন এক স্বাধীন একীভূত বাংলার স্বপ্ন দেখত, যে দেশে ধর্মীয় বিদ্বেষ থাকবে না। ওরা যখন বাংলার রাজনীতি নিয়ে অন্তহীন আলোচনায় জড়িয়ে পড়ত, তখন মনে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতো, কেউ পানির কল খুলে দিয়েছে, অনর্গল দ্রুত উচ্চারিত শব্দের স্রোত বয়ে যেত তখন।

ও ওর সমগ্র শৈশব এবং ২৮ বছর বয়স পর্যন্ত যৌবনকাল বাংলায় কাটিয়েছে, কোথাও যায়নি। ও পড়াশোনা করতে বিদেশে যায়নি, আজ তো অনেক বাংলাদেশি ছাত্রই যাচ্ছে। কাজেই ওর জীবন গড়ে ওঠার সময়ের সিংহভাগই পূর্ব বাংলায় কাটিয়েছে। খুবই সংবেদনশীল শিশু ছিল বলে বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্গে তার গভীর পরিচয় ঘটে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ওর বাবা বাংলার বিভিন্ন শহরে বদলি হয়েছেন। এ কারণে ওকে মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফেনী, চুঁচুড়া, হুগলী ও সাতক্ষীরায় বিভিন্ন স্কুলে পড়তে হয়েছে। ১৯৩৯ সালে ও ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে। তারপর ছাত্র হিসেবে ঢাকায় একটি হোস্টেলে ওঠে। সেখানে তার সঙ্গে সৈয়দ নূরুদ্দিন, সানাউল হক ও কাঁঠায়াহার সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে ও ময়মনসিংহে বাবার সঙ্গে যোগ দেয়। সেখানে ডিস্টিংকশনসহ বিএ পাস করে। এভাবে ওকে নিরন্তর জায়গা বদল করতে হয়েছে, যার মানে সম্ভবত কোনো ঘনিষ্ঠ স্কুলবন্ধু বানানোর সুযোগ ও পায়নি। তার ওপর আট বছর বয়সেই ও মাকে হারিয়েছে। এই দুটি কারণে সম্ভবত ওর চরিত্রের মধ্যে একটা অন্তর্মুখিতা, একধরনের বিচ্ছিন্নতা ও উন্মূলতা দেখা যায়।

১৯৪৩ সালে ও কলকাতায় যায়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ ডিগ্রি শেষ করে। ১৯৪৮ পর্যন্ত কলকাতাতেই ছিল। সেখানে কমরেড পাবলিশিং কোম্পানিতে ও ছিল প্রধান



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাহী এবং *কনটেমপোরারি* ও *মিসেল্যানি* নামক দুটি পত্রিকার একমাত্র সম্পাদক। *স্টেটসম্যান*সহ কয়েকটি পত্রিকায় নিয়মিত নিবন্ধ ও গল্প লিখত সে। এরপর রেডিও পাকিস্তানে যোগ দেয়। ১৯৫০ সালে ঢাকায় বদলি হয়ে আসে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর ওকে ঢাকায় নিয়োগ দেওয়া হয়। সেখানে ও বেশ কয়েক মাস ছিল। করাচিতে বদলির পর ওর মনে হতে থাকে, যেন নিজের দেশে ও চাকরি করছে না।

৪৯ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। সে হিসেবে জীবনের বড় অংশটিই ও বাংলায় কাটিয়েছে। দীর্ঘদিন বাঁচলে আজ হয়তো সে ঢাকায় থাকত। ১৯৬৯ সালে একবার এক অবকাশকালে আমরা ঢাকার গুলশানে গেলে ও জানিয়েছিল, অবসর জীবনে ঢাকায় ফিরে গুলশানেই একটি বাড়ি কিনে থাকতে চায়।

উপমহাদেশের লোকজনের সঙ্গে খেতে বসলে সে ওর বাঙালি কায়দায় আঙুল দিয়ে ভারতীয় খাবার খেত। আমি ওর আঙুলের প্রশংসা করতাম। মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসতে পছন্দ করত ও। জাকার্তায় থাকতে বাড়িতে লুঙ্গি পরত। প্যারিসেও গ্রীষ্মকালে ও লুঙ্গিই পরত। বুড়ো আঙুল দিয়ে ও আঙুলের গিঁট গুনত। বয়োজ্যেষ্ঠদের সামনে সিগারেট খেত না। মামা-মামির পা ছুঁয়ে কদমবুসি করত। ও চট্টগ্রামের পুরি, চাপাতি, সুজি পছন্দ করত। রুই মাছ, ঢাকাই পনির, উচ্ছে, আম, পশ্চিম পাকিস্তানের মিষ্টি কমলালেবু, বিশেষ করে সব ধরনের বাঙালি খাবার পছন্দ ছিল ওর। সুপারি চিবোত। আগে যেমনটা বলেছি, ও খিচুড়ি রান্না করত। ভাটিয়ালি পছন্দ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত। মাঝেমধ্যেই বাংলা গান গাইত। ওর পরিবার আমাকে বলেছিল, অল্পবয়সে ওর ভালো গানের গলা ছিল। একবার জাহাজে করে করাচি থেকে জেনোয়া যাওয়ার পথে ওই জাহাজের আরোহী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনের স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ও বিলেত থেকে পড়াশোনা করে এসেছে কি না, কারণ ওর উচ্চারণে কোনো দেশি টান ছিল না। এ মন্তব্যে ও খুব বিরক্ত হয়েছিল; কারণ, ভাবটা এমন যেন বিলেতে না গেলে কেউ শুদ্ধ করে ইংরেজি বলতে পারে না।

আমরা ফ্রান্সে আসার পর আমি খোঁজখবর নিলাম, সেখানে কোনো বাংলা শেখার ক্লাস নেওয়া হয় কি না। ১৯৬৩ সালে ক্লাস খোলা হলে আমি ভর্তি হয়েছিলাম। তিন বছর ক্লাস করে একটি ডিগ্রিও পেয়েছি। আমি ভারতীয় খাবার রান্না করাও শিখেছি। ওয়ালী, আমাদের ছেলেমেয়ে, অতিথিকে প্রায়ই রেঁধে খাওয়াতাম। আমার নিজেরও খুব প্রিয় ছিল এসব খাবার।

১৯৬৯-৭০ সালের শীতকালে আমাকে ও ছেলেমেয়েদের পূর্ব বাংলায় নিয়ে যেতে পেরে এবং ছেলেমেয়েদের ঢাকা, চট্টগ্রাম, বিশাল প্রশস্ত নদী দেখাতে পেরে সে খুব খুশি হয়েছিল। আমরা লঞ্চে করে খুলনা গেলাম। ওর এক কাজিনের সঙ্গে আমরা সুন্দরবনেও গেলাম। ওর বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও ভক্তরা ওকে খুব যত্নআত্তি করল। সবখানে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে ও খুব অবাক হয়েছিল। এমনটা ও কখনো আশা করেনি।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত কিছুর পরও ১৯৫৪ সালে ঢাকায় বদলি হওয়ার পর ও নিজেকে নিঃসঙ্গ আর উন্মূল না ভেবে পারেনি :

> কদিন আগেও ভাবছিলাম, আমি কত উন্মূল; এখন বলা চলে, আবার ঘরে ফিরে এসেছি, কিন্তু এখানে কাকে চিনি আমি? বস্তুত কাউকে না। বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি ছাড়া আমি কারো বাড়িতে যাই না, বন্ধুদের বাড়িতে গেলে সেখানে খাই। যে কয়েকজন মাত্র বন্ধু আছে আমার, তারা শুধুই বন্ধু, বলা চলে সাধারণ বন্ধু, তারাও দুজনের বেশি হবে না। লেখক হিসেবে অনেকে আমাকে চেনে, কিন্তু আমি তাদের চিনি না, হয়তো তাদের আমার ভালো লাগবে না। আত্মীয় সম্পর্কের কথা বলতে গেলে ভাই ছাড়া কারো সঙ্গে সম্পর্ক নেই। আমার কাছে বাকিদের কারো অস্তিত্ব নেই। তাদের সঙ্গে আমি দেখা করি না, তারাও দেখা করে না আমার সঙ্গে। এমনকি আমার সঙ্গে আমার সৎ বোনদের কোনো সম্পর্ক নেই (তারা ঢাকায় থাকে না)। তারা কেউ আমাকে চিঠি লেখে না, আমিও তাদের কাউকে চিঠি লিখি না। নিজেকে আমার সম্পূর্ণ উন্মূল মনে হয়, যেন আমার নিজের বলে কোনো জায়গা নেই। আমি নিঃসঙ্গ, ভীষণ নিঃসঙ্গ। আমার মতো নিজেকে এমন নিঃসঙ্গ আর কেউ বোধ করে বলে মনে হয় না। এটা কি ভালো না খারাপ? হয়তো এক দিক দিয়ে এতে আমি উপকৃতই হই, এর ফলে হয়তো যেকোনো প্রথা ভাঙা আমার জন্য সহজ হয়ে যায়, মনের দিক থেকে আমি যেকোনো জায়গাকে আমার নিজের জায়গা বলে মনে করতে পারি। কিন্তু মানসিকভাবে আমার এই একাকিত্ব



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং কারো ভালোবাসা না পাওয়াটা খারাপ। যেসব পরিবারে অনেক সদস্য, অনেক ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, তাদের দেখে আমার হিংসা হয়। উষ্ণতা আর খাঁটি মানবিক সম্পর্কের কারণে এ জাতীয় সঙ্গ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে পূর্ণতার অনুভূতি এনে দেয়। এটি (সম্ভবত) স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসার মতোই জরুরি।' [তারিখ : নভেম্বর, ১৯৫৪। এখানে আমার বলে নেওয়া ভালো যে, ওর সৎবোন এবং বিভিন্ন জ্ঞাতি-ভাইবোন ওর চেয়ে দশ-পনেরো বছরের ছোট ছিল এবং সে সময় তারা কিশোর ছিল।]

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে ও আমাকে লিখেছিল :

সবখানে এই দারিদ্র্য আর পশ্চাৎপদতা আমাকে কষ্ট দেয়। যা কিছু অসুন্দর তাই আমাকে আহত করে। শোচনীয় যা কিছু তাই আমাকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে। যখন কোনো নগ্নপদ দরিদ্রকে দেখি কোনো নিরাপত্তা নেই, আরাম-আয়েশ বলে কিছু নেই, মুখ ভগ্নস্বাস্থ্য—আমি আহত বোধ করি। তারা আমাকে কতটা কষ্ট দেয়, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি কষ্ট পাই কেননা আমি খুব সংবেদনশীল (আমাদের অনেকের চেয়ে আমি আলাদা)। কিন্তু আমার কী করার আছে? আমি এদের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি এবং হয় আমার লেখালেখি নয় কর্মের মাধ্যমে এদের জীবনে যতটুকু সম্ভব পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে পারি।

যেমনটা আগেও বলেছি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়কে ও বোধ করি অন্তর থেকে স্বাগত জানাত।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# সর্বগ্রাসী পাঠক

ও ছিল এক সর্বভুক পাঠক; ওর পড়ার কাজটা বেশির ভাগ ছাত্রাবস্থাতেই হয়েছে। তার ঢাকার বন্ধুবান্ধব সৈয়দ নুরুদ্দিন, সানাউল হক, নজমুল করিম, শওকত ওসমান, মুনীর চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে এসব নিয়ে আলাপ-আলোচনা করত। তার পড়াশোনার পরিধি খুবই বিস্তৃত ছিল। তলস্তয়, গোর্কি, পুশকিন, দস্তয়েফ্স্কি—এসব মহান রুশ লেখকের বই তার পড়া ছিল। মার্ক্স, এঙ্গেলস, টয়েনবি, কাসিরের, কাফকা, লোরকা প্রমুখ লেখকের লেখাও তার ভালোমতো পড়া ছিল। ফরাসি লেখকদের মধ্যে স্তাঁধাল, ভলতের, রুশো, দিদেরো প্রমুখ তো বটেই, সার্ত্রে, কামু, মালরো, স্যাঁত এক্সুপেরি, পল এলুয়ার প্রমুখের লেখাও তার ভালো করে পড়া ছিল। আমরা দুজন একই বই পড়তাম, তারপর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতাম কিংবা বইগুলো নিয়ে পরস্পরের কাছে মন্তব্য লিখতাম। ১৯৫৪-৫৫ সালে সে যখন ঢাকায় ও করাচিতে এবং আমি প্রথমে সিডনিতে ও পরে গ্রেনোবলে তখন আমরা এ কাজই করেছি :

> কাল আমি হান্স রুয়েশের *অন টপ অব দ্য ওয়ার্ল্ড* বইটি শেষ করলাম। বইটি মেরু অঞ্চলের এস্কিমোদের নিয়ে। খুবই হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস, খুব সুন্দরভাবে লেখা। এর মানুষগুলো ভালোবাসার উপযোগী, সরল, সুখী ও হাসিখুশি। আমি নিশ্চিত, বইটি তোমার ভালো লাগবে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখি তুমি বইটি খুঁজে পাও কি না। (তুমি বইটি পাবে পকেট বুক সিরিজে।)

তুমি কি দয়া করে পল এলুয়ার, ডিলান টমাস, পাবলো নেরুদা, পল ভালেরি, রোনাল্ড ফারব্যাঙ্ক, অঁরি মিশো, জাঁ ককতো এবং জেরার দ্য নেরভালের ওপর নিউ ডিরেকশনস বুক, রুটলেজ, আর কেগান পল লিমিটেডের বই জোগাড় করতে পারবে (যদি তোমার অসুবিধা না হয়)? অন্তত এদের কয়েকটি বই ওখানে পাওয়া যেতে পারে। তোমাকে আরনল্ড হসারের *দ্য সোশ্যাল হিস্ট্রি অব আর্ট* নামে একটি বইয়ের খোঁজ করতে বলেছিলাম। বইটি দুই খণ্ডের।

আমি স্যাঁত এক্সুপেরির *উইন্ড স্যান্ড অ্যান্ড স্টারস* বইটি পড়ে শেষ করলাম। শেষ অধ্যায়টি ছাড়া বইটি আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। আমার মনে হয়, তিনি এমন এক মহান লেখক, যিনি রুটিনে বাঁধা জীবনের হাত থেকে রেহাই পেতে ওড়ার পথ বেছে নিয়েছিলেন। [১২ বছর বয়সে ওয়ালী পাইলট হতে চেয়েছিল।]

আমার সেই পাগল, সুবন্ধুটি চট্টগ্রাম ফেরার পথে আমাকে *ফ্রেঞ্চ থটস ইন দ্য এইটিনথ সেঞ্চুরি* বইটি পাঠিয়েছে। বইটি প্রকাশ করেছে লন্ডনের ক্যাসেল অ্যান্ড কোং। বইটিতে রুশো (রমাঁ রোলাঁর লেখা), ভলতের (অঁদ্রে মরোয়ার লেখা) এবং দিদেরোর (এদুয়ার হেরিয়র লেখা) স্থান দেওয়া হয়েছে। আমি শুধু দিদেরোর অধ্যায়টি পড়তে চাই; তাকে নিয়ে খুব বেশি কিছু আমি জানি না।

অস্ট্রেলিয়ায় আমাদের বন্ধুমহলের অধিকাংশই ছিল অস্ট্রেলীয় বুদ্ধিজীবী। আমরা একে অপরের সঙ্গে বই লেনদেন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতাম, নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতাম। সর্বসাম্প্রতিক বইটি কে আনতে পারে, এ নিয়ে চক্রটির মধ্যে একপ্রকার প্রতিযোগিতা ছিল। সে সময় বয়সে তরুণ ছিলাম বলেই হয়তো আমরা সবাই একে অপরের দেশকে জানার ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে একটা তাগিদ বোধ করতাম। একটা দারুণ ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি আমরা অনুভব করতাম। আমার মনে পড়ে রিচার্ড রাইট, হাওয়ার্ড ফাস্ট, ফকনার, স্টেইনব্যাক, আরস্কিন কল্ডওয়েল প্রমুখ লেখকের বইয়ের পাশাপাশি বহু অস্ট্রেলীয় এবং অন্যান্য লেখকের বই পড়েছি আমি।

চিকিৎসাবিজ্ঞানেই হোক আর জীববিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান বা প্রত্নতত্ত্বই হোক—সব রকম নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সে খোঁজখবর রাখত। সে সংবাদপত্র, সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা পড়ত। এই সব কটি বিষয়ে নতুন নতুন বইপত্র কিনতে ও নিয়মিত বইয়ের দোকানে যেত। এদিক থেকে ওর ঢাকার অনেক বন্ধুর (লেখক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) সঙ্গে ওর খুব একটা তফাত ছিল না।

করাচিতে থাকতে ও এক পারসি পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

> আমার অনুরোধে বাড়ির বয়স্ক মহিলাটি তাদের ধর্মগ্রন্থ *আবেস্তার* একটি কপি আমাকে দিলেন। বইটির কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়ে আমি সত্যি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। ওখানে এক ফরাসি ভদ্রলোকের করা জরথুস্ত্রের স্তোত্রের একটি ফরাসি অনুবাদ ছিল। লোকটার নাম ভুলে গেছি। যদি জোগাড় করতে পারো, দয়া করে বইটি পড়ে দেখো।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারসিরা বিচ্ছিন্ন এক সম্প্রদায়। ওরা ওদের বাইরে বিয়েশাদি করে না। আমার কাছে ওদেরকে এমন নাজুক আর কোমল মনে হয় যেন, মানবসম্প্রদায় হিসেবে তাদের অস্তিত্ব শিগগিরই বিলীন হয়ে যাবে। তারা সবাই এমন ফ্যাকাশে আর বর্ণহীন, মনে হয় যেন জ্যান্ত লাশ। তারা নিশ্চয়ই জেনেটিক্সের নিয়মের বলি হয়েছে, কেননা তারা নিজেদের মধ্যেই বিয়েশাদি করে। মোটের ওপর তারা সবাই চুপচাপ ধরনের, সৎ, আর তাছাড়া তাদের মধ্যে এক ধরনের মর্যাদার ব্যাপার আছে। গবেষণার জন্য এরা খুবই উপযুক্ত বিষয় হতে পারে। করাচিতে এদের ৫০০ পরিবার আছে। [৫ মে ১৯৫৫]

আধুনিক সাহিত্যের জগতেই তার আগ্রহ বেশি ছিল। ইংরেজিতে প্রকাশিত সব কটি নতুন উপন্যাসই সে পাঠ করত। লোকে যেহেতু প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞেস করে, ও কী কী বই পড়ত, আমি এলোমেলোভাবে এখানে কয়েকটি নাম উল্লেখ করছি: এজরা পাউন্ড, টি এস এলিয়ট, স্যামুয়েল বেকেট, ফ্রান্‌ৎস কাফকা, ভার্জিনিয়া উলফ, ইভলিন ভাউ, ডিলান টমাস, ডি এইচ লরেন্স, এল ডুরেল, অ্যাংগাস উইলসন, অ্যালবির নাটক, জেমস জয়েসের *ইউলিসিস*, গ্রাহাম গ্রিন, প্রেসকট, সিজার পাভিস, আলবের্তো মোরাভিয়া, মিগেল দে উনামুনো, টমাস মান, হেরমান হেস, গুন্টার গ্রাস, সার্ত্রের নাটক, আলবের কামুর *আউটসাইডার*, *দি প্লেগ*, লেভি স্পাউসের *স্যাড টপিকস*, কাসিরের, আইজাক ডয়েটশার, পাবলো নেরুদা, অধিকাংশ মার্কিন ঔপন্যাসিক এবং বিভিন্ন



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি, দার্শনিক প্রমুখ।

ইন্দোনেশিয়া থেকে যখন আমরা চলে আসি, তখন শুধু আটটি কাঠের বাক্সবোঝাই বই বয়ে আনতে হয়েছে আমাদের। এ সবগুলো বই-ই আমরা জাকার্তায় কিনেছি। প্যারিসে নতুন বই কিনতে প্রতি সপ্তাহে ও দূতাবাসের কাছে শঁজেলিজের ড্রাগ স্টোরে যেত।

ও আমাকে *বাবুরনামা* পড়িয়েছে। ওর কাছে আল বেরুনির *ভারত* বইটির একটি চমৎকার সংস্করণ ছিল। তা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে ওর কাছে ছিল প্রচুর বইপুস্তক।

সফোক্লিসের মতো প্রাচীন গ্রিক লেখকই হোক আর ফরাসি ভলতের বা বাঙালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই হোক, বিশ্বনাগরিক হিসেবে পৃথিবীর সব সাহিত্যকে ও নিজের সাহিত্য বলে গণ্য করত। তাদের চিন্তা, তাদের পদ্ধতি বা তাদের কাছ থেকে যা কিছু সে আদায় করতে পেরেছে, তার সবই সে তার নিজের সংস্কৃতি ও মানুষ—পূর্ব বাংলার মুসলমান কৃষকদের ওপর প্রয়োগ করত। ও তার লেখার মাধ্যমে ওর দেশের মানুষের দারিদ্র্য ও পশ্চাৎপদতা দূর করার জন্য যতটা সম্ভব ভূমিকা রাখতে চাইত। সে একবার বলেছিল, 'আমি একজন মুক্ত মানুষ। জগৎ আমাকে গ্রহণ করুক আর নাই করুক, পুরো জগৎটিই আমার।' পশ্চিমা আর অপশ্চিমা সাহিত্যের মধ্যে ও কোনো তফাত করত না। জাপানি হোক আর ইতালীয়ই হোক, হোক তা প্রাচীন বা আধুনিক, বিশ্বের সব সাহিত্যকে ও



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের অভিন্ন উত্তরাধিকার বলে গণ্য করত।

জীবনের শেষ দিকে, যুদ্ধ চলাকালে ওর মনের যখন বিধ্বস্ত অবস্থা, ও তখন গোয়েন্দা কাহিনি ছাড়া আর কিছুই পড়তে পারত না। আমাদের মেয়ের মনে আছে ওর সঙ্গে শঁজেলিজের মনিহারি দোকানে গিয়ে শ্যান্ডলার, ড্যাশিয়েল হ্যামেট, রেক্স স্টাউট প্রমুখ লেখকের পেঙ্গুইনের সবুজ মলাটের বই কেনার কথা।

## শিল্পী

AMARBOI.COM

বেশ কিছুদিন সে বলেছে, ও লেখক না শিল্পী হতে চায়—বয়সে তরুণ বলে এ সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ওর কাজিন আমাকে বলেছিল, ১৪-১৫ বছর বয়সে ও খুব আঁকাআঁকি করত। ওদের সঙ্গে থাকতেন ওর সৎখালা। তিনি আমাকে বলেছেন, একদিন ও পড়া না করে ছবি আঁকছিল। ওর বাবা এসে চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে উঠিয়ে ওর আঁকা ছবি ছিঁড়ে ফেলেছিল। ওয়ালী তখন নিচু স্বরে বলেছিল, 'ছবি আঁকা চালিয়ে যেতে হলে আমাকে মাথার চুল ছেঁটে ফেলতে হবে।'

সব ধরনের শিল্প-আন্দোলনের খোঁজখবর রাখত ও।

১৯০০-১৯১৪ পর্যন্ত প্যারিসের শিল্প ও সাহিত্যের জগতের ওপর একটা বই পড়ছিলাম। বইটিতে একটি চমৎকার



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গিতে এ সময়ের কবি, শিল্পী প্রভৃতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এটি এমন এক সময় যখন সেজান, ভ্যান গঘ, গগাঁ, সুরা প্রমুখ শিল্পীর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসা শক্তি কেবল দানা বাঁধতে শুরু করেছিল বলা যায়। এর পরপরই এলেন পিকাসো, মাতিস, দেরায়া, ভ্লামিঙ্ক। নাবি গ্রুপ নামে ক্ষণস্থায়ী তবে প্রতিভাধর একটি গ্রুপও এসেছিল। অঁরি রুশো ও ম্যাক্স জাকবের মতো কবিরা ছিলেন খুবই মনোমুগ্ধকর। এরপর আছেন নাট্যকার আলফ্রেড জারি যিনি *উবু-রয়*-এর মতো নাটক লিখেছেন। বইটিতে বলা হয়েছে, পুরো সময়টিই ছিল খুব প্রাণবন্ত, আধপাগল মানুষের ছড়াছড়ি, পরমের সন্ধানে প্রতিটি ক্ষেত্রে নতুন নতুন আলোচনার সূত্রপাত ঘটানোর রুচি ছিল তাদের মধ্যে। এ সময়কালটি খুবই তারুণ্যময় আর উত্তুঙ্গ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা বলে প্রতীয়মান হয়। আফসোস, আমি ফরাসি পড়তে পারি না। এ সময়কালটিকে আমি আরও বিশদভাবে জানতে চাই। এমন স্ফুলিঙ্গময় একটি শিল্পগোষ্ঠী আর কোনো দেশে তৈরি হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এ কারণে ফ্রান্সকে আমি পছন্দ করি। [২৬ ডিসেম্বর ১৯৫৪]

১৯৫৮ সালে করাচিতে ও জয়নুল আবেদিনের ওপর দ্বিতীয় একটি নিবন্ধ লিখেছিল (প্রথমটি লিখেছিল দুর্ভিক্ষের ওপর করা বিখ্যাত স্কেচগুলোর প্রদর্শনীর অল্প কিছুদিন পর)। ও জুবেইদা আগা ও সাদেকাইনের ওপরও নিবন্ধ লিখেছিল। সে সময় এরা ছিল অখ্যাত তরুণ শিল্পী।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকার্তায় থাকতে ও প্রতিকৃতি আঁকত। রাষ্ট্রদূতের একটি এবং আমার বেশ কয়েকটি প্রতিকৃতি এঁকেছিল ও। তবে সেগুলোর কোনোটির ব্যাপারেই কখনো তৃপ্ত হতে পারেনি। আমার কাছে এখনো ওর যে চারটি বিমূর্ত চিত্র আছে, সেগুলো জাকার্তায় আঁকা।

আমরা যেখানেই গেছি, সেখানকার জাদুঘর আর চিত্রশালা ঘুরে দেখেছি। প্যারিসের সব কটি জাদুঘর আমরা দেখেছি। এ ছাড়া ফ্লোরেন্স, রোম, হল্যান্ডের (বিখ্যাত গগেনহেইম ভ্যান গঘ জাদুঘর) বেশ কিছু জাদুঘর এবং স্পেনের এল প্রাদো জাদুঘরেও গেছি। ও ইমপ্রেশনিস্ট আর আধুনিক চিত্রকরদের ভক্ত ছিল। শীতে আমরা দুজনে একত্রে ভেনিস সফরে গেছি।

যেসব পাকিস্তানি শিল্পী প্যারিসে আসত, তাদের সাহায্য করার জন্য ও যথাসাধ্য চেষ্টা করত। রশিদ চৌধুরী, সাদেকাইন, নভেরা আহমেদ—এরা পরামর্শের জন্য প্রায়ই তাকে ফোন করত।

সে আধুনিক স্থাপত্য ও আসবাব পছন্দ করত। ১৯৫৫ সালে করাচিতে থাকতে ও বাঁশের কয়েকটি আসবাব তৈরি করেছিল। জাকার্তায় আমরা যে বাসাটি ভাড়া নিয়েছিলাম সেটিতে কোনো আসবাবপত্র ছিল না। ওকে সব আসবাব বানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ও ইন্দোনেশিয়ার সুদৃশ্য কাঠ দিয়ে আসবাব বানিয়েছিল।

> কিছু বেতের চেয়ার ডিজাইন করব ভাবছি। এখানকার মানুষ খুব সুন্দর সুন্দর বেতের চেয়ার বানায়। আমার মনে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় ভালো ডিজাইন পেলে একঘেয়ে ডিজাইন থেকে মুক্তি পেতে ওদের ভালোই লাগবে। পরীক্ষামূলকভাবে আমি একটি বানিয়ে নেব (কল্পনা করো আমি আসবাবপত্রের ডিজাইন করছি)। [১৫ অক্টোবর ১৯৫৪-তে ঢাকা থেকে লেখা চিঠি]

তা ছাড়া :

আমার মাথায় একটা নতুন আইডিয়া এসেছে। কিন্তু সেটা বাস্তবে রূপ দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। যদি পারতাম ভালো লাগত।

বাংলার গ্রামাঞ্চলে ওরা বাঁশ দিয়ে বাড়ি বানায়। দেশে বাঁশের অভাব নেই। তাছাড়া এটি সহজে বাঁকানো যায় এবং টেকসই উপাদান। আমার মনে হয় এই উপাদানটি দিয়ে আমি খুবই শৈল্পিক একটি বাড়ি ডিজাইন করতে পারব। এতে খরচও বেশি পড়বে না। আমার মতে, বাংলার শৈল্পিক মোটিফ, চিরাচরিত ফুল ও গাছপালা প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং পর্ণ চালা তৈরির নতুন নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করে এমন কিছু তৈরি করা সম্ভব, যা একই সঙ্গে হবে একেবারে প্রথাবিরোধী ও বৈপ্লবিক। গ্রামবাসীদের দীর্ঘদিন ধরে বাঁশের বাড়িঘর ব্যবহার করতে হচ্ছে (দক্ষিণ আমেরিকার কিছু অংশের লোকদের যেমনটা করতে হয়) : সে ক্ষেত্রে নতুন আইডিয়া প্রয়োগ করে তারা একই উপাদান দিয়ে শিল্পসম্মত বাড়িঘর তৈরি করবে না কেন? যেমন ধরা যাক, জাপানে ওরা মাত্র কয়েক ডলার খরচ করে বাড়ি বানিয়ে ফেলে; তার পরেও ওদের বাড়ির ভেতরটা কত শৈল্পিক।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ থেকে আমার মনে হয়েছে, যে-কেউ অনেক কিছু করতে পারে এবং যদি করার ইচ্ছে থাকে তাহলে তার সামনে প্রচুর সুযোগ আছে।

প্রতিটি ক্ষেত্রে ও ছিল গভীরভাবে নান্দনিক। যে বাড়িতেই আমরা থেকেছি, ও দেয়াল থেকে কুৎসিত চিত্রকর্ম সরিয়ে ফেলে সেখানে নিজের আঁকা কোনো ক্যানভাস বসিয়ে দিত; কখনো একটা আধুনিক নকশার আরামকেদারা, একটা নিচু টেবিল, কোনো আধুনিক গালিচা। ফুলদানি কিনে আনত বা নিজে আসবাব ডিজাইন করত, যেমনটা ও করেছে করাচি ও জাকার্তায়। অফিসেও সে একই কাজ করত। ও অযত্ন-অবহেলায় সাজানো কিছু পছন্দ করত না। তার চেয়ে বরং দেয়াল বা পুরো ঘর ফাঁকাই রেখে দিত। সব বিচারেই ও ছিল শিল্পী। মাঝেমধ্যে ও আমার জামাকাপড়ও ডিজাইন করে দিত, কাপড় বেছে দিত, বাসায় মেহমান এলে টেবিল সাজাত, ঝকমকে টেবিল ক্লথ কিনে আনত, কিনে আনত অপ্রচলিত আধুনিক শৌখিন অলংকার। নিজের শিল্পকর্ম ও নিজেই বাঁধাই করত। দূতাবাসের জন্য লেখা পুস্তিকা নিজে সম্পাদনা করত, নিজের বইপত্রের প্রচ্ছদ আঁকত। আলোকচিত্র তোলার ব্যাপারে ওর আগ্রহ ছিল, বেশ কিছু ভালো ছবিও তুলেছে।

ভাটিয়ালি, নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসংগীত, ওয়েস্টার্ন, ধ্রুপদি সংগীতের পাশাপাশি ভারতীয় মার্গ সংগীতও পছন্দ করত ওয়ালী। রবিশঙ্কর, আলি আকবর খানের কনসার্ট শুনতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতাম আমরা; আবার ব্রামস, বেটোফেন, চাইকভস্কি, শুবার্টের অসমাপ্ত সিম্ফনি, কালোদের আধ্যাত্মিক সংগীত, জ্যাজ প্রভৃতিও শুনতে যেতাম আমরা।

## লেখক

তবে ও সবচেয়ে বেশি পছন্দ করত লিখতে। আমার মনে হয়, শুধু লিখেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারলে ওর খুব ভালো লাগত।

> কারো জন্যে কাজ করাটা আমি ঘৃণা করি। আমি স্বাধীন থাকতে চাই। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? তুমি যে কেন এখানে নেই, থাকলে তোমার সঙ্গে কথা বলতাম (এমন অনেক বিষয়ে যেগুলো লিখতে পারছি না) এবং সিদ্ধান্ত নিতাম।

আবার :

> নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব অনিশ্চয়তায় ভুগছি। ভবিষ্যতে কী করব জানি না; কেননা এখন যা করছি তা করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে অন্য কোনো সুযোগ এখন খোলা নেই। অদূর ভবিষ্যতেও সেগুলোর ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো লাগত। এজন্যেই যে বইটি (*দি আগলি এশিয়ান*) এখন লিখছি তার ওপর এত ভরসা।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হচ্ছে বাইরের কোনো প্রকাশক এটি গ্রহণ করলে একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলব। [৫ নভেম্বর ১৯৫৪]

পরে ১৫ অক্টোবর ১৯৫৪ তারিখের একটি চিঠিতে ওই বই প্রসঙ্গে সে লিখেছে :

> যে বইটির ওপর কাজ করছি সেটি সম্পর্কে কিছু লেখা কঠিন। বইটি লিখতে চাইলে বিশাল জায়গা নিয়ে ফেলবে। এটি আসলে এখানকার গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার ওপর ভিত্তি করে লেখা উপন্যাস, তবে এর পরতে পরতে আছে আমার ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা। এর আঙ্গিকটি মজাদারও হতে পারে। জানি না, হবে কিনা।

২৪ নভেম্বর ১৯৫৪ তারিখে লেখা এক চিঠিতে নিজের ছোটগল্প সম্পর্কে ও লিখেছে :

> তোমাকে আরো আগেই চিঠি লেখা উচিত ছিল, কিন্তু ইদানীং আমি ভয়ানক ব্যস্ত। অফিসে যাওয়ার আগে এবং অফিস থেকে ফিরে কাজ করছি। কেননা যতটা সম্ভব দ্রুত আমাকে আমার ছোটগল্পগুলোর একটা বাছাই দিয়ে রাখতে হবে। (তোমাকে আগেই বলেছি এখানে একজন প্রকাশক আমার বাংলা গল্পগুলোর একটি সংকলন প্রকাশ করতে যাচ্ছেন।) বেশির ভাগ গল্পই সংগ্রহ করে ফেলেছি। এগুলোর ওপর খুবই জরুরি ঘষামাজা চালানোর কাজে এখন আমি খুব ব্যস্ত। প্রতিটি গল্পের প্রথম পৃষ্ঠার লেটারিংও আমি নিজেই করছি। তুমি ভাষাটা না বুঝলেও এসব টাইটেলসহ একটি প্রুফ কপি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। দেখতে কেমন হয়েছে সেটা অন্তত বলতে পারবে। যা হোক, পুরো সংকলনটি প্রকাশের



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে প্রস্তুত এবং ঘষামাজা সবকিছু আগামী শুক্রবারের মধ্যে হয়ে যাবে। ইংরেজি বইটির ওপর কাজ আপাতত বন্ধ রাখতে হয়েছে, কেননা বাংলা সংস্করণটি অত্যন্ত জরুরি। তারপর আমাকে পিইএন (এ সংগঠনটির কথা তুমি নিশ্চয়ই জানো)-এর জন্যে একটি বাংলা নাটক লিখে দিতে হবে। ১২ হাজার শব্দের মধ্যে হতে হবে। তার মানে একবার কলম চলতে শুরু করলে দুই সপ্তাহের বেশি লাগবে না। সংকলনটির জন্যে গল্প জোগাড় করতে নানান জায়গায় যেতে হচ্ছে, কেননা যেসব পুরনো পত্রিকায় এগুলো বেরিয়েছিল সেগুলোর কোনোটিই আমার সংগ্রহে নেই। এসবের খোঁজখবর করতে গিয়ে বছর দশেক আগে লেখা আমার অজস্র গল্প পেলাম। এগুলো আবিষ্কার করে বিহ্বল হয়ে গেলাম। কোনো কোনোটা পড়ে বিব্রত বোধ করলাম।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৫৪ বন্ধুর সম্পর্কে ওয়ালী লিখেছিল :

গতকাল আমার নাটকের পুরোটা পুনর্লিখন শেষ করলাম। নাটকটা এখন যে অবস্থায় আছে তাতে আমি সন্তুষ্ট। পরিচ্ছন্ন আঁটসাঁট কাহিনীর এ নাটকটি সংক্ষিপ্ত, কিছুক্ষণ পর পর ঘটনা ঘটতে থাকে...

আজ খুব চমৎকার একটি সন্ধ্যা কাটল মনে হচ্ছে। নির্বাচিত লোকজনের সভায় আমার নাটকটি পাঠ করা হলো। নাটকটি পড়ল আমার এক বন্ধু। গত চার বছরে সে তিনবার জেল খেটেছে। এখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে আবার নিয়োগ পেয়েছে। বয়সে আমার চেয়ে ছোট হলেও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। কারাবরণের সময় সে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো বেশি পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছে। আমি লক্ষ্য করলাম তার মর্যাদা দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সে নিজেও নাট্যকার। তবে আমাকে যে জিনিসটি আকর্ষণ করেছে সে হলো তার চিন্তার পরিচ্ছন্নতা। সে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমার নাটকটি এমন এক সভায় পাঠ করল যাদেরকে সহজে মুগ্ধ করা কঠিন। নাটক সে বরাবরই ভালো পাঠ করে আর আমার নাটকটি সে পড়ল খুব তৃপ্তি নিয়ে। তার পাঠ শেষ হলে স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা শুরু হলো। চলল ঘণ্টাদুয়েক। সব মন্তব্যই যে বাহবাসূচক তা নয়: তারা এমন কিছু ছোটখাটো ভুলভ্রান্তির উল্লেখ করল যেগুলো আমি নিজেও অনুভব করেছি। নাটক বিষয়ে অগাধ পড়াশোনা ছাড়া সেসব কারো চোখে ধরা পড়ার কথা নয়। তবে সবাই খুব আন্তরিকভাবে স্বীকার করল যে, নাটকটি অত্যন্ত শক্তিশালী। তোমাকে আগেই বলেছি, এটি আমার প্রথম নাটক। ওদের খুব পছন্দ হয়েছে বলে আমার ভালো লাগছে। আমি খুশি। প্রথমটায় আমি মনে করেছিলাম ওরা নেহাৎ বলতে হয় বলে দুয়েকটা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করবে। কিন্তু নাটকটির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে ওরা যে এমন দীর্ঘ স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনায় জড়িয়ে যাবে আমি কল্পনা করিনি। আলোচনা চলার সময় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ওরা আমার কথা ভুলে গেছে, ওরা যেন কোনো বিখ্যাত নাটক নিয়ে আলোচনা করছে। এটি আমাকে সত্যি খুব [অস্পষ্ট] করেছে। আমি খুব খুশি, তোমাকে বলে রাখছি, প্রিয়তমা, আমি লেখা অব্যাহত রাখতে চাই। লেখাই আমার মূল শক্তি। [গুরুত্ব আরোপ ওর নিজের]



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকৃতি, মেঘ, আকাশ, বৃষ্টির ব্যাপারে ও ছিল খুব সংবেদনশীল। সিডনিতে ও আমাকে লিখেছিল :

> আমাদের এখানে এখন গ্রীষ্মকাল। তোমার চিঠিতে লিখেছ, অকস্মাৎ বসন্তের আগমনী সংকেত দেখে তুমি খুব খুশি হয়েছ। আমিও খুশি, তবে তোমার সম্পূর্ণ বিপরীত ঋতুর পরিবর্তন দেখে। মেঘের কত বিচিত্র নকশা, তুমি তার কতগুলো দেখেছ। গতকাল মেঘ দেখছিলাম। মনে হলো মেঘগুলো অন্য ধরনের। পরে সকালে যখন লিখছি, লিল এসে হাজির। সে বলল, দিনটা ইংলিশ ডের মতো। তখন জানলাম মেঘের রং আর নকশা দেখে ও এ মন্তব্য করেছে। [১১ অক্টোবর ১৯৫৪]

পরে লিখেছে :

> চারিদিক অন্ধকার না হয়ে আসা পর্যন্ত আমরা হাঁটতে থাকলাম। আমার খুব ভালো লাগল। খুব পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা রাত...। আবহাওয়া পাল্টে গেছে...। আগামী মাস তিনেক আমরা খুব চমৎকার আবহাওয়া পাব। ঢাকায় শীতকালটা সত্যি মনোমুগ্ধকর। সূর্যকিরণের রং, বৃষ্টিমুক্ত শুকনো তরতাজা মোলায়েম বাতাস: সবই খুব আরামদায়ক।

আবার লিখেছে :

> আকাশ লাল, চমৎকার লাল। জীবন আবার এর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পেরে নিজেকে খুব সুখী বোধ করলাম। লিখতে ভালো লাগে আমার, ভালো লাগে তোমার কাছ থেকে প্রেমময় চিঠি পেতে।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬১ সালে আদমজী পুরস্কার পেয়ে ও খুবই উৎসাহিত বোধ করেছিল। একে একধরনের স্বীকৃতি হিসেবে নিয়েছিল ও। এ পুরস্কার পেয়েই ও আবার লিখতে শুরু করেছিল। *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসের বেশির ভাগটাই ও লিখেছিল আল্পস এলাকায় আমার মা-বাবার বাড়িতে ছুটি কাটানোর সময়। প্যারিসে রোববার আর ছুটির দিনগুলোর বেশির ভাগ সময় ও লেখার পেছনে ব্যয় করত। ও লিখত মূলত বাংলায়। আমাদের ফ্ল্যাটে ও পাজামা পরেই দ্রুত পায়চারি করত, সিগারেটে টান দিত তারপর হঠাৎ নিজের ডেস্কে বসে পড়ে সেই সুদর্শন, রহস্যময় সংকেতলিপিতে লেখা শুরু করত, যেটায় সব বর্ণ একটা দণ্ড থেকে ঝুলে আছে বলে মনে হয়। গভীর রাত অব্দি লিখে যেত ও। প্যারিসে থাকতে ও মঞ্চায়নের জন্য ছাত্রছাত্রীদের একটি নাটক লিখে দেওয়ার অনুরোধে সাড়া দিয়ে লিখেছিল—*উজানে মৃত্যু*। এ ছাড়া *তরঙ্গভঙ্গ*, *চাঁদের অমাবস্যা*, *কাঁদো নদী কাঁদো* লিখেছিল ও; আর লিখতে শুরু করেছিল ফরাসিদের নিয়ে এক প্রহসন *হাউ ডাজ ওয়ান কুক বিনস*। এই প্রহসন লেখার আইডিয়া ও পেয়েছিল ম্যানিলার এক রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে। সেখানে এক শোরগোলকারী ফরাসি নাগরিক তাকে পরিবেশন করা শিমের ব্যাপারে অভিযোগ তুলে বলছিল, এগুলোর রান্না করার তরিকা ঠিক হয়নি।

তবে ওর মূল লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার গ্রামের মানুষদের নিয়ে লেখা। ওয়ালী হয়তো আধুনিক চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে থাকবে। তবে এগুলো ও প্রয়োগ করেছে নিজ দেশের পরিস্থিতিতে। ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে সিডনিতে আমাকে লেখা এই চিঠিতে ওর লক্ষ্য সবচেয়ে ভালোভাবে ফুটে উঠেছে :

> আমার বইপত্র আর লেখালেখির ব্যাপারে তুমি খুব প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন তুলেছ, তা হলো, আমি যে গ্রাম আর তার মানুষজন নিয়ে নিয়ে লিখি, গোর্কি ওদের যতটা কাছ থেকে জানতেন, অতটা জানাশোনা কি তাদের নিয়ে আমার আছে? জানি না, তুমি এটা মনে করো কি না যে ওদের নিয়ে লিখতে গেলে ওদের মধ্যে আমাকে বসবাস করতে হবে। আমার পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। গ্রামের লোকদের নিয়ে লিখতে গেলে আমাকে কেন গ্রামের মানুষ হতেই হবে? এটা অত্যাবশ্যকীয় নয়। অন্যদিকে, গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো কী শুধু সেটাই আমি জানি না, সেই সঙ্গে তাদের গঠন, তাদের ইতিহাস, তাদের সম্ভাবনা এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ে আমি ওয়াকিবহাল। আমি তাদের গোটা জীবন বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে পারি, আর সেটা পারি আমি গ্রামের মানুষ নই এবং গ্রামে বসবাস করি না বলে। ওদের মধ্যে বসবাস করলেও গুটিকয়েক গ্রামবাসীর জীবনের আক্ষরিক এবং ফটোগ্রাফিক বিবরণ তুলে ধরা আমার লক্ষ্য হতো না। বরং আমি যাদের চিনতাম, তারা যে এক বৃহৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক বুনোটের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ সেটা বোঝানোই আমার লক্ষ্য। (আমার কথা বুঝতে পারছ?)



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার লেখা বই, আমার নাটক, আমার গল্পগুলো ব্যক্তি অভিজ্ঞতার ফটোগ্রাফিক প্রতিফলন নয়, বরং এগুলো তার চেয়ে বেশি কিছু। অন্তত আমি সেটাই মনে করি। আমি যখন ধর্মীয় কুসংস্কার, মোল্লাদের হাতে গরীব মানুষের শোষণকে আক্রমণ করি, তখন আমি গোটা ব্যবস্থাটাকেই আক্রমণ করি। [গুরুত্ব আরোপ ওয়ালীর নিজের]

১৯৬৯-৭০-এর শীতকালে আমরা যে বার পূর্ব পাকিস্তানে ছুটি কাটাতে আসি, সে বার চট্টগ্রামের একটি রেস্তোরাঁয় ওয়ালীর সম্মানে নৈশভোজ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে এক ওয়েটার এসে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনিই কি *লালসালু*র লেখক?' এ অপ্রত্যাশিত স্বীকৃতিতে ওয়ালী খুব গৌরব বোধ করেছিল।

AMARBOI.COM

## মানুষ ওয়ালী

ওয়ালী ছিল অবিশ্বাসী, কিংবা বলা যায় অজ্ঞেয়বাদী। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও মুসলমান হিসেবে গর্ব বোধ করত। ও অক্লান্তভাবে মুসলিম-বিশ্বের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে যেত। পশ্চিমা দেশগুলো যখন বর্বর ছিল, তখনকার মুসলিম সভ্যতার উৎকর্ষের প্রসঙ্গ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ করত। একাদশ শতাব্দীর স্পেনের মতো প্রথম মুসলিম সভ্যতার আদিপর্বের মহত্ত্ব তুলে ধরত ও; একদিকে আলজেরীয় যুদ্ধের কারণে, অন্যদিকে আরবরা সব সময় ইউরোপীয়দের পথের কাঁটা হয়ে থেকেছে বলে ফ্রান্সে যেটিকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো (ও এভাবেই ব্যাখ্যা করত), আরবরা প্রাচ্যের সম্পদ মসলা, রেশম প্রভৃতির পথ রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে আর এখন লোভনীয় তেলক্ষেত্রগুলোর ওপর বসে আছে। সালাদিনের মহত্ত্বের কথা বলত ও। আরব দৃষ্টিকোণ থেকে ক্রুসেডের ভিন্ন একটি চিত্র আঁকত ও।

আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ওর বন্ধুবান্ধবদের মতো ও মার্ক্সবাদী কি না। হ্যাঁ, ও মার্ক্সবাদী ছিল। সেটা বুঝতে গেলে আপনাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী বছরগুলোয় পঞ্চাশ আর ষাটের দশকে নিজেদের বসাতে হবে। সময়টা অধিকাংশ লেখক ও শিল্পীর কাছে ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি আর এর ফলে দারিদ্র্যের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভের প্রত্যাশা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল। ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, আলজেরিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ স্বাধীনতা লাভ করল। সেটা ছিল মাও জে দং আর তাঁর প্রতিটি চীনা নাগরিককে এক গামলা করে ভাত দেওয়ার ঘোষণার কাল; সেটা ছিল বানদুং শান্তি সম্মেলনের কাল, যে সম্মেলনে এশিয়া আর আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন সব কটি দেশ জড়ো হয়েছিল এবং সেটা ছিল এ সম্মেলনে সৃষ্ট আশাবাদের কাল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা ছিল চৌ এন লাই, সুকর্ণ, নাসের, নেহরু, ন্‌ক্রুমা, কাস্ত্রো প্রমুখ নতুন দেশের মহান নেতৃবৃন্দের আর নির্জোট আন্দোলনের কাল। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার উৎসবে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিয়েছিল আমার স্বামী। সেখানে চে গুয়েভারার সঙ্গে ওর দেখা হয়। সেটা প্যাট্রিস লুমুম্বা, জোমিও কেনিয়াত্তা, ফ্রান্‌ৎস ফানঁ, মার্তিনিকের কবি আইমে সেজেয়ারেরও কাল। এঁদের লেখা সে পড়ত। সেটা ছিল এমন এক সময়, যখন মার্কিন দেশে কালো মানুষেরা সমান অধিকারের দাবি তুলছে; মার্টিন লুথার কিং, অ্যানজেলা ডেভিসরা মিছিল করছেন; অনর্গল বোমাবর্ষণ আর তাদের দেশটিকে নিষ্পত্র করার অভিযানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে ভিয়েতনামি জনগণ; আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে চত্বরে এবং বিশ্বজুড়ে এ যুদ্ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ উঠছে আর শেষে এই ক্ষুদ্র দেশটির স্বাধীনতা লাভ (যেটি ঘটেছে আমার স্বামীর মৃত্যুর পর)। সেটি আবার চাঁদে মানুষের অবতরণের কালও। আমার মনে পড়ে সাক্কো আর ভানসেত্তির মামলার কথা (নিজের মেয়ের কাছে সাক্কোর লেখা চিঠি), সেটি ও আমাকে পড়তে দিয়েছিল; মনে পড়ে রোজেনবার্গ মামলার কথা, সেটি ঘটেছিল আমরা অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালে, এ মামলায় ওদের মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল।

ইতিহাস তখন সরলরৈখিক হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল, উন্নতি থেকে ক্রমশ আরো উন্নতির দিকেই যেন এর যাত্রা,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবসভ্যতার জন্য প্রতিশ্রুতিময় ইতিহাস। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব তখনো ভেঙে পড়েনি, অর্থনৈতিক মন্দাও শুরু হয়নি।

ওর চৌকস স্বভাব ছিল ওর নম্রতারই এক প্রকার অংশ, কিংবা আমি বলতে চাই নিজেকে ওর রক্ষা করার একধরনের বর্ম। খুব সংবেদনশীল ছিল বলেই হয়তো নিজেকে ওর নিষ্কলুষ করে তুলতে হয়েছিল। অনেকে এটিকে খুব আপত্তিকর আচরণ বলে মনে করত। ও চাইত, আমিও চৌকস আর একরকম দূরবর্তী মানুষ হই। আমার শাড়ি পরা ও পছন্দ করত, শাড়ি পরতে আমারও ভালো লাগত। তবে সত্যিকার বন্ধুদের সামনে ও নির্ভার হতো এবং হাসিঠাট্টা করত।

সন্তানদের ভালোবাসত ও। মনে পড়ে, জন্মের পর প্রথম কয়েক মাস সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সিমিন একটানা কাঁদত। ওয়ালী এ সময়টাকে বলত সিমিনের 'সামাজিক সময়'। এ সময় ও সিমিনকে কোলে তুলে নিত। সিমিনের মাথা ওর হাতের ওপর এলানো। এ অবস্থায় ও সিমিনের পিঠ মৃদু চাপড়ে লাউঞ্জ বরাবর ঘণ্টা খানেক হাঁটাহাঁটি করত। সিমিনের অসংখ্য ছবি ও তুলেছে, তারপর গল্পের মতো করে সেগুলো সাজিয়েছে। সিমিনের বাবা যখন হঠাৎ করে মারা যায়, ওর তখন ১১ বছর বয়স। বাবার মৃত্যুর খবর সিমিন বিশ্বাস করেনি। পরে নিজের ঘর ও কালো রং দিয়ে মুড়ে দিয়েছিল। ইরাজ জন্ম নিলে এক মেয়ে আর এক ছেলেসন্তান পেয়ে ওয়ালী খুব খুশি হয়েছিল। দুজনের নামই ও রেখেছে। মনে পড়ে, ইরাজের সঙ্গে ওর



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলা করার দৃশ্য: ওয়ালী হাতে একটি পুতুল নাচিয়ে ইরাজকে গল্প শোনাত।

এখানে আরেকটা কথা বলে নিতে চাই। ওয়ালীর বাংলা লেখালেখির একটা বড় অংশ শ্লেষাত্মক হলেও সে মানুষটা মোটেও বিষণ্ন বা নৈরাশ্যবাদী ছিল না। বরং উল্টো। ও ছিল সুরসিক। মানুষের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, তাদেরকে বাড়িতে দাওয়াত দেওয়া, ওয়াইনের গ্লাস ঘিরে তুমুল আড্ডা জমানো, চড়ুইভাতি, সন্তানদের সঙ্গে খেলাধুলা ইত্যাদি ভীষণ পছন্দ করত ও। আমার মনে হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার মতো এক অসংস্কৃত, ইংরেজিভাষী দেশে ও সবচেয়ে আরাম বোধ করেছে। ওখানে ওর বহু অস্ট্রেলীয় বন্ধুবান্ধব জুটেছিল। ওদের দেশ সম্পর্কে ও যতটা কৌতূহলী ছিল, ওরাও ওর দেশ সম্পর্কে ছিল ততটাই কৌতূহলী।

কর্মক্ষেত্রে যেসব মানুষের সংস্পর্শে ও এসেছে—ওর সহকর্মী, স্টাফ, সাংবাদিক বা অন্য কেউ, তারা সবাই ওকে পছন্দ করত এবং ওর প্রশংসা করত। সবার ব্যাপারে ও এত মনোযোগী আর আন্তরিক ছিল যে, সবার মন জয় করে ফেলত অনায়াসে। খুব ভালো সঙ্গ দিতে পারত ও। সুবক্তা ছিল, বিশ্বাসযোগ্য করে গল্প বলতে পারত। ওর সঞ্চয়ে সব সময় মজাদার কোনো বক্তব্য থাকত, সবচেয়ে ব্যতিক্রমী মন্তব্যটি ছুড়ে দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ওর। যেমন:

> আজ সকালে একটা শিশু আমার ঘরে এসে এটা-সেটা এলোমেলো করে দিল। পরে আমি সেসব গোছানোর সময়



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে মনে বললাম: সময়ের ধ্বংসযজ্ঞ একটি শিশুর ধ্বংসযজ্ঞের মতো, কেননা উভয়ই নিজের অজান্তে এ কাজ করে। নিজের মন্তব্য নিজেরই ভালো লাগল। আমি কল্পনা করলাম সময় শিশুর মতোই চিন্তাভাবনা না করে মানুষকে অগোছালো করে দিয়ে যাচ্ছে। যা হোক, শিশুদের আমি পছন্দ করি। তবে সময় কী তা জানি না। কেননা সময়কে কেউই বুঝতে পারে না। একটা বড় সংখ্যার মতোই এটি বিমূর্ত। [১৩ ডিসেম্বর ১৯৫৪]

ওই একই চিঠিতে সে লিখেছে:

নাচ হল নিরবচ্ছিন্ন গতি, ছন্দোময়, নিরন্তর। নাচের এই সারবস্তুটি ব্যালেতে অনুপস্থিত। ব্যালে খুব বেশি একঘেয়ে এবং সুনির্দিষ্ট প্রকাশভঙ্গিতে বাঁধা। এ যেন একটি খাঁচার চার দেয়ালের ভেতরে পাখির ওড়া। এ খাঁচা যতদিন না ভাঙা যাচ্ছে, ব্যালেও ততদিন নিশ্চল থাকবে আর পাখিটিও পূর্ণ স্বাধীনতা পাবে না।

১৯৫৫ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি পিআইএর উড়োজাহাজে ঢাকা থেকে করাচি যাওয়ার পথে ওর মন্তব্য:

আমি শুধু বাইরে তাকালাম। সূর্য ডুবছে। আর মিনিট বিশেকের মধ্যে সূর্য দেখা যাবে না। আমার মনে হয়, এত উঁচু থেকে তাকালে বিশ্বটা (বা বলা যায় পৃথিবী) এক রহস্যময় সৌন্দর্য ধারণ করে। দূরের অস্পষ্টতা, বিস্তীর্ণ বিশালতা, নীরব শূন্যতা (এমন নিরাবেগভাবে ছড়িয়ে থাকা, মানুষের অনায়ত্ত নীরব দূরত্ব) সম্ভবত আমার মধ্যে এক অদ্ভুত বিষণ্নতা তৈরি করে। আমি ভয়ানক বিষাদক্লিষ্ট। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। আতোয়াঁ দ্য স্যাঁত এক্সুপেরির কথা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে পড়ে আমার। হয়তো এই নীরব বিস্মৃতি, শূন্যতা, নীরবতম নীরবতার কাছে আসার জন্যে, একে বোঝার জন্যে বা হয়তো একে জয় করার জন্যই তিনি আকাশে উড়েছিলেন। আন্দেজের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময়ও কি তিনি এমন ভয়ানক বিষণ্ণ বোধ করেছিলেন? এখন আমাদের মাথার ওপরেও মেঘ। সূর্যের সোনালী আভায় সাদা মেঘের ওপরের অংশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। ওর নিচের অংশটি এখনও ধোঁয়াশা। পৃথিবীটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে শুধু এখানে-ওখানে সূর্যের আলোয় আলোকিত লেক চোখে পড়ে, ধোঁয়াশার ভেতর স্পষ্ট সাদা সাদা ছোপ।

পৃথিবীটা এত অপূর্ব। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এ উপলব্ধি কাউকেই আনন্দ দেয় না। এ এমন এক বিদঘুটে উপলব্ধি যা মন খারাপ করে দেয়। আমারও সেই অনুভূতিই হচ্ছিল। এ সৌন্দর্য উপলব্ধির পাশাপাশি বিষণ্ণতার কারণ কি এটাই যে, এর ফলে মানুষ এ কথাও বুঝতে পারে, এ সৌন্দর্য ফেলে চলে যেতে হবে? কেন?

AMARBOI.COM

সদাশয়তাকে ও মানুষের সবচেয়ে জরুরি গুণ বলে মনে করত :

এলুয়ারকে (আশা করি এ লোকটির ঘন ঘন উল্লেখে তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়নি) নিয়ে তার ভূমিকায় ক্লদ রয় বলেছেন, তিনি একটি ছাড়া এলুয়ারের সব কটি গুণের কথা বর্ণনা করেছেন। সেই গুণটি হলো তার সদাশয়তা। পল এলুয়ার একজন ভালো মানুষ। তিনি বলেছেন, দুর্ভাগ্যবশত সদাশয়তা নামক সদ্‌গুণটি আজ এমনই মূল্য হারিয়েছে যে,



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটি নিয়ে আর কেউ মাথা ঘামায় না। স্টাইল বা সাহিত্যেও এটির দেখা পাওয়া ভার। তিনি বলেছেন, পল এলুয়ার তার আশপাশের সবাইকে নির্ভার, আশ্বস্ত ও বদান্য বোধ করাতেন। আজ কোথাও কার্যত কোনো ভালো মানুষ নেই। আরাগঁই হোন, আর ক্লদেল বা মিশো বা মঁএরলঁ হোক, কেউই সদাশয় মানুষ নন।

আমার মনে হয়েছে, এটি এক বিরাট প্রশংসা!

গ্যাব্রিয়েল পেরির ওপর চমৎকার একটি কবিতা লিখেছেন পল এলুয়ার। পেরি *হিউমেনাইট* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, ১৯৪১ সালের ১৫ ডিসেম্বর জার্মানরা তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল। জেরা সেধে এবং নির্যাতন চালিয়েও পেরিকে তার আদর্শ পরিত্যাগ করতে রাজি করানো যায়নি। বন্ধুদের উদ্দেশে লেখা তার শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন: 'আমার বন্ধুদের জানিয়ে দাও, আমি আমার জীবনের আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছি। আমার দেশবাসীকে জানিয়ে দাও, আমি মরতে যাচ্ছি, যাতে করে ফ্রান্স বেঁচে থাকে। ফলাফল ইতিবাচক। আমাকে যদি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হয়, আমি একই পথ বেছে নেব।' [এরপর ফরাসি ভাষায় এলুয়ারের কবিতার অংশবিশেষের কপি। গুরুত্ব আরোপ ওয়ালীর নিজের। ১৫ নভেম্বর, ১৯৫৪ সালে লেখা চিঠি।]

আমার ধারণা, ওয়ালী যখন আমাকে বলেছিল ও একজন 'পরিচ্ছন্ন মানুষের' কথা লিখতে চায়, তখন ও আসলে এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল।



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়ালীর করা ইংরেজি অনুবাদ থেকে ওর যে দুটি উপন্যাস আমি ফরাসিতে অনুবাদ করেছি, সে দুটির নায়ক চরিত্রের মধ্যে আমি মিল খুঁজে পাই। এর একটি *লালসালু* (*লার্ব সাঁ রাসিন*, প্রকাশক লো সোই) আর অন্যটি *চাঁদের অমাবস্যা* (এখনো অপ্রকাশিত) এবং কিছুটা কম মাত্রায় তার 'কেরায়া' গল্পটির মধ্যেও এ মিল পাওয়া যায়। এ গল্পটিও আমি অনুবাদ করেছি। ১৯৭৪ সালে খ্যাতনামা পত্রিকা *এসপ্রি*-তে এটি ছাপা হয়েছিল।

*লালসালু*র ফরাসি সংস্করণে (এর অংশবিশেষ তিনি নতুন করে লিখেছিলেন) মূল চরিত্র মজিদ এক প্রতারক (একটি পর্যায় পর্যন্ত, কেননা ক্ষুধার তাড়না তাকে পরিচালিত করছে)। বইটির শেষে যখন বন্যার পানিতে মাজারটি ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, মজিদ মাজারের পাশেই বসে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়, যেন নিজের মিথ্যের জালে সে নিজেই আটকে গেছে, সে নিজে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে বলে নয়, এ প্রতারণার ওপরই সে নিজের জীবন নির্মাণ করেছে বলে; নিজের কাছে অর্থাৎ নিজের বানানো চরিত্রটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা এবং এ প্রক্রিয়ায় এক প্রকার মহিমা অর্জন করা ছাড়া তার আর কোনো পথ খোলা নেই।

*চাঁদের অমাবস্যায়* যুবক শিক্ষক যখন কাদেরের অপকর্ম সম্পর্কে অবগত হয়, তখন সে আর তার স্বপ্নের জগতে আশ্রয় নিতে পারে না। সে তখন প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা সত্ত্বেও পুলিশের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ অপরাধের কথা



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ করতে তাকে কেউ বাধ্য করেনি, বরং উল্টোটা। কিন্তু তার মনে হয়, নিজের কাছে তাকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং সাক্ষী হওয়ার দায়িত্বও তাকে পালন করতে হবে। এটি এক সদাশয়, সৎ মানুষের কাজ।

নিচে তার ফরাসি প্রকাশকের কাছে ওয়ালীর লেখা চিঠি তুলে দিলাম, যেখানে ও *চাঁদের অমাবস্যা* উপন্যাসটি ব্যাখ্যা করেছে :

> কাদের একটি অশীলিত, কামার্ত ও সম্পূর্ণ কল্পনাশক্তিহীন মানুষ। কোনো আধ্যাত্মিক গুণ ধারণ করার দাবি সে করে না, কোনো মহৎ অনুভূতিও তার মধ্যে অনুপস্থিত, এমনকি প্রেমের ধারণাটিও তার কাছে অপরিচিত। তার স্নেহপ্রবণ বড় ভাই-ই কেবল অর্ধেক কল্পনা করে যে, কাদের কোনো পীর হতে পারে। ছোট ভাইয়ের অস্বাভাবিক আচার-আচরণের কারণেই তার এমন প্রতীতী জন্মায়। শিক্ষক নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে একটা পর্যায় পর্যন্ত এ ব্যাপারটিরই সুযোগ গ্রহণ করে। কাদের ওই মৃত মেয়েমানুষটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়: একজন একটি অপরাধের কর্তা, আরেকজন সেই অপরাধের শিকার। উপন্যাসটির মূল বিষয় একটি অপরাধের-এক অশুভ কর্মের জ্ঞান। যুবক শিক্ষক হয়ে দাঁড়ায় এ জ্ঞানের ধারক। এ জ্ঞানের সঙ্গে যে দায়িত্ববোধ যুক্ত, সেটি তাকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। এ অশুভ কর্মটি শিক্ষকের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। আমি যেটা বলতে চাই তা হলো, সেই অশুভ কর্মটি বা সেই



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপকর্মের হোতা, কেউই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সবচেয়ে জরুরি হলো এরকম একটি অপকর্মের বাইরের মানুষটির আচরণ। এটি এমন এক সমস্যা যা ভয়ঙ্কর মাত্রা পাচ্ছে। যুবক শিক্ষকটি এই অপরাধের কাছ থেকে পালায় না, সে পালায় তার আবশ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত দায়িত্ব থেকে। খুনি যখন এ অপকর্মের দায় অস্বীকার করার কাজে যুবক শিক্ষককে আর সাহায্য করতে ব্যর্থ হয় এবং তার যে স্বপ্নের জগতে কোনো কিছু করার দরকার পড়ে না সেই জগতে তাকে বিচরণ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়ে যুবক শিক্ষক একটি সিদ্ধান্ত নেয়। মানুষকে তার নির্জন ভুবনে নিজের বিবেচনাতেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

যুবক শিক্ষকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমি শুধু একটা কথাই যোগ করতে চাই: তাকে যখন এমন একটি খোলা জায়গায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে সে আর বাস্তবতার কাছ থেকে লুকাতে পারছে না এবং দায়িত্ব এড়াতে পারছে না, তখনও সে চুপ করে থাকতে পারত। কেন থাকেনি? সে যখন জানতে পারে, নিহত মেয়েমানুষটির আত্মীয়স্বজনরাও বেকায়দা পরিস্থিতিতে পড়ার আশঙ্কায় এ বিষয়টি নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করার বদলে এর পেছনে জিনের আসরকে দায়ী করতে আগ্রহী, তখন নিজের কাপুরুষতার ব্যাপকতা সে উপলব্ধি করতে পারে। সে অকস্মাৎ বিদ্রোহ করে বসে। যুবক শিক্ষক কাপুরুষ থেকে এক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহসী মানুষ এবং একই সঙ্গে এক শহীদে পরিণত হয়। শিক্ষকের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর কী হয়, এটি নিয়ে বইটির কোনো মাথাব্যথা নেই। সেটি আর জরুরি নয়। এ কারণে ওই শিক্ষকের ভাগ্যে কী ঘটল তা নিয়ে আমি কোনো সাসপেন্স তৈরি করার চেষ্টা করিনি। মূল বিষয় হলো তার সিদ্ধান্ত।

ধর্মের বেশভূষা ধরে যে জালিয়াতি আর প্রতারণা চলে অবশ্যই সেটির প্রতিবাদ করতে চেয়েছে ও। যেকোনো ধর্মেরই ক্ষেত্রে ও তা করতে চেয়েছে। তবে যে ধর্মটিকে সে ভালো করে জানে, যেটির ভেতরে সে বেড়ে উঠেছে এবং যেটিকে সে তার দেশের মানুষের পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্যের জন্যে দায়ী বলে মনে করত সেটির ক্ষেত্রে ও আরো বেশি করে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছে। আমার মনে হয়েছে, ও ঠিক ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল না, ও ছিল মোল্লা ও গ্রামের মৌলভিদের হাতে ক্ষমতার অস্ত্র হিসেবে ধর্মের ব্যবহারের (অথবা মানুষের স্বাধীনতার পথরুদ্ধকারী যেকোনো ধর্মীয় কর্তৃত্বের) বিরুদ্ধে। সে হিসেবে মজিদ একটি খলচরিত্র ও দাদাসাহেব এক প্রকার নির্বোধ ছিলেন। ভাইয়ের ত্রুটিপূর্ণ আচরণকে তিনি পীরত্ব বলে গণ্য করতেন।

তবে এসব কিছুর বাইরে, আমার মনে হয়, ও অন্য একটি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছে: হয়তো মানুষের ভেতরের ভালোত্ব—সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, জীবন তাকে যত বিদঘুটে পরিস্থিতির মধ্যেই নিক্ষেপ



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করুক না কেন—তাকে নিজের নিয়তির একমাত্র নিয়ন্তা করে তোলার ক্ষমতা দেয়। হয়তো, সবকিছুর ওপরে তিনি স্বাধীনতাই চেয়েছেন।

'কেরায়া' গল্পে এক বৃদ্ধ আর এক শিশুর একজন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে গুড় নিয়ে আসার কথা ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ীটির দেখা পাওয়া যায় না। কাজেই তারা ফিরে আসে, ফিরে আসে শিশুটি আর বৃদ্ধটির লাশ, তারা যেন নৌকাটির সঙ্গে বাঁধা, কেননা ওটিই তাদের নিয়তি। তাদের অন্য কোনো জীবন নেই। যখন মৃত্যু আসে তখন বিনা প্রতিবাদে এবং বলতে হয় বিনা বাক্যব্যয়ে এক প্রকার মর্যাদা সহকারে তারা সেটিই গ্রহণ করে।

উপসংহারে ওয়ালীকেই বলতে দিই :

> আগের চিঠিতে যে বেঙ্গালী শরতের কথা বলেছি, সেটি আর নেই। আবহাওয়া খুবই বাজে। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। অন্য ধরনের বৃষ্টি, কেননা দমকা হাওয়া এসে তাতে থেকে থেকে ঝাপটা মারছে। এখানে আসার পর থেকে প্রচুর বৃষ্টি দেখেছি, তবে সেগুলো ছিল বাতাসের এমন তোড় ছাড়া বৃষ্টি। কিন্তু এটি একেবারে আলাদা। আমার দরজা-জানালা থরথর করে কাঁপছে। বাইরের গাছপালা সারাক্ষণ আর্তনাদ করছে। মেঘ খুবই অস্থির।
>
> এভাবে বিছানায় অসুস্থ আর নিঃসঙ্গ পড়ে থাকলে আমি আকাশ-পাতাল চিন্তা করি। অতীতের কথা ভাবি, অতীতের ছোট ছোট ঘটনার কথা। শুনশান নিঃসঙ্গতায় বিশেষত এরকম বাইরে ঝড়বৃষ্টির দিনে আমি বর্তমান



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বৃষ্টির মধ্যেও কোথাও একটি কাক ডাকছে; মাঝেমধ্যে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাওয়া-আসা করছে। আমার ঘরটি এক হারানো পৃথিবী; আমি কি সময়হীন বোধ করছি? তবু ভালো যে, আমি বইটি লিখছি। এটি এক ধরনের সাহস ও উদ্দেশ্য যোগান দিচ্ছে। এর ফলে আমি অতীত ও ভবিষ্যতের ক্রমশ আগুয়ান শূন্যতার বোধকে অস্বীকার করতে পারছি।

উপলব্ধি করতে পারছি কারো সঙ্গে পরিচয় থাকা কতটা জরুরি, বন্ধু নয়, পরিচিতজন নয়, এমন কেউ যে আমাকে বোঝে, যার ওপর নির্ভরতা জাগে, নিজেকে সম্পূর্ণ করে তোলার অনুভূতি তৈরি হয়। মানুষের সাহায্য দরকার, এমন ধরনের সাহায্য যা অগোচরে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে। মানুষের এও জানা থাকা দরকার যে সাহায্য আসবে কেননা তার সাহায্য দরকার, কেননা মানুষ আসলে নিঃসঙ্গ। মানিক, তোমার কথা আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাবি, যেমন ভাবি মায়ের কথা, যেন তিনি এখনও বেঁচে আছেন, কিংবা ভাবি ভাইয়ের কথা।

সত্যি করে বলছি, যখন ভালোবাসার কথা বলি, তখন আমি নিজেই জানি না, আমি কী বোঝাচ্ছি। এটি অপব্যবহারে জীর্ণ এক শব্দ। এটি এমন এক প্রতীক যা আমরা গ্রহণ করে নিই এবং সবাই ব্যবহার করি। সেজন্য এর চেয়ে ভালো কিছু জানা নেই বলে আমিও এটি ব্যবহার করি। কিন্তু কারো ভালোবাসাই একরকম নয়। একেক জনের ভালোবাসার প্রয়োজন একেক



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রকম। একেক জনের ভালোবাসার তীব্রতাও একেক রকম। যখন আমি বলি যে, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তখন হয়তো কথাটি দিয়ে এই বোঝাতে চাই যে, তোমার কাছে আমি সহজ বোধ করি, স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি তোমার কথা ভাবি এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমি ভাবি যে, তোমার সঙ্গে সবকিছু নিয়ে কথা বলা যায়। এটা কি কোনো বোঝাপড়া? দুটি মানুষ মানসিকভাবে পরস্পরের কাছে এমন নগ্ন হয়ে ওঠে যে, তারা একে অপরের অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়, মানসিক নগ্নতা থেকে জন্ম নেয় এক ধরনের ঐক্য। আমরা এত সহজে মানসিকভাবে নগ্ন হতে পারি না...। মনের ওপর একটা পর্দা ঝুলিয়ে রাখার প্রয়োজন হলে বুঝতে হবে তোমার পক্ষে নগ্ন হওয়া সম্ভব নয় এবং সে কারণে ভালোও বাসা সম্ভব নয়। [গুরুত্ব আরোপ ওয়ালীর নিজের। ২৬ অক্টোবর ১৯৫৪।]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

# পরিশিষ্ট

'আমার স্বামী ওয়ালী' প্রথম প্রকশিত হয় *প্রথম আলো* ঈদসংখ্যা ২০০৩-এ। রচনাটির সঙ্গে সংযুক্ত ছিল সাজ্জাদ শরিফের 'পটভূমি'। সেটি এখানে মুদ্রিত হলো।

## পটভূমি

**সাজ্জাদ শরিফ**

AMARBOI.COM

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ফরাসি স্ত্রী আন মারি ওয়ালীউল্লাহ এ লেখাটি লিখেছিলেন ওয়ালীউল্লাহর একটি সম্ভাব্য ইংরেজি রচনাবলির ভূমিকা হিসেবে। রচনাবলিটি প্রকাশের ব্যাপারে আন মারি বাংলা একাডেমীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং তার সম্ভাব্য যুগ্ম-সম্পাদক হওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছিলেন। পরে, যা হোক, সে রচনাবলি কোনো কারণে আর প্রকাশিত হয়নি।

'ওয়ালী, মাই হাজবেন্ড, অ্যাজ আই স হিম' শিরোনামের এ লেখায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ব্যক্তিত্ব, মন, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া ও জীবনের বহু অজানা অংশের ওপর আন মারি আলো ফেলেছেন এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের পটভূমিতে রেখে সেসব বুঝে উঠতে



দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছেন। ওয়ালীউল্লাহকে ভালোভাবে জানার জন্য আগামীতে এ লেখার কাছে তার পাঠকদের বারবার ফিরে ফিরে আসতে হবে।

আন মারি কবে এ লেখা শুরু করেছিলেন, আমাদের জানা নেই। তবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মামাতো বোন এবং স্বনামধন্য অধ্যাপক ও সমাজকর্মী সুলতানা সারওয়াত আরা জামানকে ১৪ ফেব্রুয়ারি '৯৮-এ লেখা এক চিঠিতে আন মারির বোন ফ্রাঁসোয়া থিবো জানাচ্ছেন, 'যে লেখাটি আপনাকে পাঠাচ্ছি—"ওয়ালি, মাই হাজবেন্ড, অ্যাজ আই স হিম"—আন মারি তার জীবনের শেষ দিন, এমনকি শেষ প্রহর পর্যন্ত সেটি সংশোধন করেছেন।'

লেখাটি আমাদের কাছে হস্তান্তরিত করার জন্য সুলতানা সারওয়াত আরা জামানের কাছে আমরা গভীরভাবে ঋণ স্বীকার করছি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~